হিরণ্যগর্ভ
দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
২৯শে আষাঢ়, ১৪২৬

Hiranyagarbha
Volume 12, No. 2
हिरण्यगर्भ
द्वादश वर्ष, द्वितीय संख्या
तारिख-१५ जूलाई, २०१९

২৯শে আষাঢ়, ১৪২৬ 15th July, 2019

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—

ব্যাসদেবপুত্র শুকদেব	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
পঞ্চকেদারের পথে পথে	শ্রীসৌরভ বসু	08
জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	10
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	11
শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	12
মহর্ষি মুদ্‌গল	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	14
জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	16
অভয়	শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়	18
ভগবান বিষ্ণু ও মহর্ষি মৌদ্‌গল্য	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	20
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	21
কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	22
কৌল অবধূত শ্রীশ্রীনবম তারাপুরী	শ্রীঅরিন্দম মিত্র	24
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	27

हिन्दी विभाग ः—

व्यासदेव पुत्र शुकदेव	श्रीमती ज्योति पारेख	29
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	32
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	34
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	35
महर्षि मुद्‌गल	श्रीमती ज्योति पारेख	36
पंचकेदार के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	37
ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	39
श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	40
भगवान विष्णु और महर्षि मौद्‌गल्य	श्रीमती ज्योति पारेख	41
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	42

English Section ः—

Sri Sukdev – Veda Vyasa's Divine Son	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	47
Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48
Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	50
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	52
Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	54

ISBN No. 978-81-940673-3-7 Cover : Sri Sri Shukdev

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

শ্রাবণ লগ্নে আকাশ-কটাহ পরিব্যাপ্ত কাজল কালো মেঘের জলসিঞ্চনে স্নাত হয়ে সুতৃপ্ত হয় রৌদ্রদগ্ধ পৃথ্বীর তৃষিত অন্তর। গম্ভীর মেঘডম্বরু মাঝে ভেসে আসা পুণ্য শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুণ্য রথযাত্রার তিথি সমাগত। প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা মায়ের স্বর্ণোজ্জ্বল রথশীর্ষে উড্ডীন জয়ধ্বজা ঘোষণা করুক সকল পঙ্কিলতার অবসান — সনাতন ধর্মের জয়ধ্বনি হউক নির্ঘোষিত।

১৪২৬ বঙ্গাব্দের শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি সমাগত। এই পুণ্যলগ্নে মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়, শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ পরমহংস ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি-আবিলতা নিবেদন করি। পুণ্য শঙ্খরবে মুখরিত হউক আশ্রমপ্রাঙ্গণ — ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দনের সৌরভে আমোদিত হউক শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের মন্দিরগৃহ। গুরুমহারাজগণের শ্রীচরণে ভক্তি বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা করি, হে সর্ব নিয়ন্তা — চতুর্দিকের পঙ্কিলতামুক্ত চিত্তের শুদ্ধতা, সততা, নিঃস্বার্থতা ও সমর্পণের বারিধারা আমাদের অন্তঃকরণে ফল্গু বারিধারার ন্যায় যেন স্বতঃ-প্রবাহিত থাকে।

হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি মহর্ষি ব্যাসদেবপুত্র, জন্মসিদ্ধ, বেদ-বেদান্ত-ভাগবতবেত্তা, শিবতুল্য মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের চরণকমলে। তাঁর অনবদ্য লেখনীতে শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন স্কন্দপুরাণোক্ত তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে তাঁর আবির্ভাব, সাধনা ও লীলা সমুদয়। তিনি দ্বিতীয় ব্যাসদেবের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সৌমমূর্ত্তি কঠোর তপস্বী, পরম ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব মুনি-জন-দেব-গন্ধর্ব বন্দিত, নিত্যগোলোক নিবাসী, পূর্ণ সিদ্ধ মহাত্মা।

আজ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে এই পরম ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার চরণে আমরা প্রণত হই — তাঁর অক্ষয় অনুকম্পায় আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতার আলোকবর্তিকা সততঃ প্রজ্জ্বলিত হউক।

— হরি ওম্ তৎ সৎ —

It is the month of Shravana; streams of sparkling raindrops come dancing down from dark expanse of the sky, like blessing from Heaven, to quench the parched lips of mother earth. In the distance, one can hear the clarion call of conch shells that ushers in the spiritual ambience of the auspicious annual Ratha Yatra of Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra. The flags fluttering proudly atop their chariots symbolize the triumph of good over evil and the perpetuity of the Sanatan Dharma.

Shri Shri Guru Purnima Tithi is just round the corner. Like in every year, we would offer our profound homage to our revered Guru Parampara and lie down in obeisance to Mahamandaleshwar Shri Shri Nanga Baba, Mahavatar Shi Shri Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashay, Our Holy Father Sachchidananda Paramhansa and Holy Mother Sree Sree Maa. As the glorious aroma of flowers, incense and sandalwood hang heavy in the air, we lie prostrate at their holy feet to seek Their compassion for attaining honesty, purity, selflessness and devotion in our humble hearts.

We take this opportunity to dedicate this issue of Hiranyagarbha to the immortal saint Brahmarshi Sukdeva, the illustrious ascetic son of the great sage Maharshi Krishnadwaipayan. A born ascetic, he was as glorious as Vyasdeva himself, a complete master of the Vedas-Vedanta-Bhagawat scriptures, an emancipated Mahayogi and venerated by mankind, saints and Gods alike.

On the auspicious occasion of Guru Purnima, let us offer our homage to this great saint and seek His kind blessings to blossom the lamp of wisdom, piety and chastity in our humble hearts.

ব্যাসদেবপুত্র শুকদেব

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাকালে ভগবান শিব একদা ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবী পার্বতীর সহিত কর্ণিকার বন পরিবৃত সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য, বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু ও অশ্বিনীকুমার ইঁহারা সকলেই তাঁহার আরাধনারত ছিলেন। সেই সময় যোগধর্ম পরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাসও ভগবান শিবের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের গুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয়সমূহ রুদ্ধ করিয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবাদিদেবের আরাধনা করিতে করিতে ব্যাসের একশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল কিন্তু তথাপি তাঁহার তপঃশক্তির হ্রাস বা কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত না হওয়ায় তদ্দর্শনে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল।

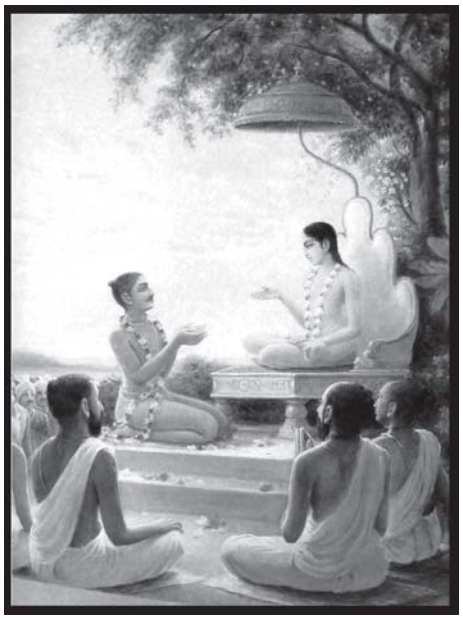

শ্রীশ্রীশুকদেব

অনন্তর মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর ভক্তি ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিয়া বলিলেন, ''দ্বৈপায়ন! তুমি অচিরেই তোমার অভীষ্ট পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি তাঁহাতেই সমর্পণ করিবে। তাহার যশঃ-সৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।'' মহাদেবের বর প্রাপ্ত হইলে পরে ব্যাসদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ক্লান্ত দেহে হোমকার্য্য করিবার মানসে অরণী কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণ পূর্বক অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরম রূপবতী অপ্সরা ঘৃতাচী আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তখন ব্যাসদেব কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ব্যাসদেবের ঐরূপ অবস্থা দর্শনে তখন ঘৃতাচী শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণপূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন নিজ চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য প্রবলবেগে অরণী ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই অরণীর উপরেই তাঁহার বীর্যস্খলন হইল এবং ব্যাসদেব তখন আরও বলপূর্বক অরণীমন্থন করিতে লাগিলেন। তখন সেই অরণী হইতেই দ্বিতীয় ব্যাসদেবের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর সৌম্যমূর্তি ব্রহ্মর্ষি শুকদেব আবির্ভূত হইলেন এবং যজ্ঞস্থলে পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্রবিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'শুক' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 'শুকঃ' কথার অর্থ হইল অগ্নি বা বীর্য সম্বন্ধীয়। তদনন্তর গঙ্গাদেবী স্বয়ং হিমালয় হইতে আগমনপূর্বক নবজাত শিশুকে পবিত্র সলিল দিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীসকল প্রক্ষালন করিয়া স্নান-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব সেই দিব্য-শিশুর জাতকর্মাদি সমাপন করিলে শুকদেবের জন্য স্বর্গ হইতে দিব্যদণ্ড, কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইল। গন্ধর্বেরা তখন তাঁহার স্তুতিগান, অপ্সরাগণ নৃত্য, বায়ু দিব্য-পুষ্প বর্ষণ ও দেবগণ দুন্দুভি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা, লোকপাল, দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণও তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে দেববিধান অনুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন। অতুল তেজ সম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণ মাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদয় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে জ্যোতির্ময় হইয়া প্রকট হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম রক্ষার্থ দেবগুরু বৃহস্পতির

নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমগ্র বেদবেদাঙ্গ, ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্য নিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপস্যাপূর্বক জ্ঞানযোগবলে সকল মহর্ষি ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর শুকদেব সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক অবধারণ করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন হইলেন এবং মোক্ষধর্ম অবলম্বনে তাঁহার অভিলাষ জন্মিল।

অতঃপর ধর্মাত্মা শুকদেব পিতার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও কপিল-দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে ব্যাসদেব পুত্রকে মোক্ষধর্ম বিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া বলিলেন ''বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষশাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মানুষের মত অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। কোনভাবে মিথিলাধিপতির নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না। সর্বদাই তাঁহার বশবর্তী হইয়া অবস্থান করিবে। তিনি অতীব ধর্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রে বিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।''

রাজর্ষি জনকের পুরে গমন করিলে পর শুকদেবের সহিত রাজর্ষির যে লীলায়ন হইয়াছিল তাহা মহাভারত মহাকাব্যের এক অবিস্মরণীয় পর্যাঙ্ক। তথায় রাজর্ষির সহিত শুকদেবের নানা সদ্বিষয়ে বহু আলোচনা হয় এবং তিনি রাজর্ষি জনককে মায়া সংসারের আবরণমুক্ত এক মহান পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রাজর্ষির নিকট মোক্ষযোগ শিক্ষালাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে তখন তথা হইতে পিতৃসকাশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পিতৃআজ্ঞানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন এবং বর্হিষদ পিতৃগণের অন্যতম পুলস্ত্যনন্দনগণের 'পীবরী' নাম্নী মানসী কন্যাকে বিবাহ করেন। পীবরী স্বয়ং যোগিনী, যোগীপত্নী ও যোগীজননী ছিলেন। ইহার পর ব্যাসদেব-তনয় শুকদেব পূর্ণসিদ্ধ আপ্তকাম হইয়া সমগ্র বিশ্ব পর্যটন করিতে লাগিলেন।

তপোবলে ভগবান শুকদেব নিত্যলোক গোলকধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাপরের কৃষ্ণলীলায় দেখা যায় যে, সকল দেব-দেবী ও অন্তরীক্ষবাসী ভক্ত দেবতাগণ বৃন্দাবন-লীলা আস্বাদন করিবার জন্য বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষরাজি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুকদেব ছিলেন শ্রীরাধিকার অতিপ্রিয় একটি শুকপক্ষী। শ্রীরাধা তাঁহাকে মধুর স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম বলিতে শিখাইয়াছিলেন। শুকপক্ষী ঠিক শ্রীরাধিকার স্বরেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম বলিত। একদিন রাধারানী পক্ষীটিকে আনারদানা দুধ এবং ভাত খাওয়াইতেছিলেন। সে সময় পক্ষীটি হঠাৎ উড়িয়া চলিয়া গিয়া নন্দগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সখাগণ পরিবৃত হইয়া কুঞ্জে বসিয়াছিলেন তথায় নিকটস্থ একটি আনারবৃক্ষের ডালে গিয়া বসিয়া শ্রীরাধার মত খুব মধুর স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছিল। তখন কৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া পক্ষীটিকে দেখিতে লাগিলে পক্ষী বলিয়া উঠিল ''ওঃ! আমি খুব দুঃখী ও মন্দভাগ্য। আমি এতই কৃতঘ্ন যে আমি আমার প্রভুস্বামিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি।'' তখন কৃষ্ণ শুকপক্ষীকে নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষণেই ললিতা ও বিশাখা, শ্রীরাধার দুই প্রধানা সখী আসিয়া পক্ষীটিকে চাহিল এবং কৃষ্ণকে বলিল যে উহা শ্রীরাধিকার পক্ষী। কিন্তু কৃষ্ণকে ছাড়িয়া পক্ষী কোনমতেই সখীদের কাছে যাইতে চাহিল না। তখন সখীদ্বয় মা যশোদাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। মা যশোদা আসিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে শুকপক্ষীকে লইয়া সখীদের হস্তে প্রদান করিলেন এবং কৃষ্ণকে ঘরে লইয়া চলিয়া গেলেন।

এই শুকপক্ষীটিই শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বার্তা দেওয়া-নেওয়া করিত। যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তাঁহাদের ভৌমলীলা পরিসমাপ্তি করিয়া গোলোকে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন শুকপক্ষীও তাঁহাদের সঙ্গে গোলোকে গমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ দুইজনেই উহাকে বলিলেন যে মর্ত্যে থাকিয়া তাঁহাদের ভাগবত-লীলা কথা প্রচার করিতে। তখন শুকপক্ষী কাঁদিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহাকে বলিলেন যে, ''তুমি ছাড়া উপযুক্ত আর কেহ নাই যে ভাগবত-কথা বলিতে পারে।'' শ্রীরাধা-কৃষ্ণ গোলোকধামে গমন করিলে পর, তখন শুকপক্ষী ভাগবত কথা কোথায় হইতেছে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিল। অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কৈলাসে শিবলোকে গিয়া পৌঁছিল এবং দেখিতে পাইল যে ভগবান শিব পার্বতীদেবীকে ভাগবত-কথা বলিতেছেন। .... ইহার পরের কাহিনী স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়, যথা —

কল্পান্তরে নিত্যসিদ্ধ শুকদেবের আরও এক অভিনব জন্ম-কাহিনী পাওয়া যায়। কৈলাসের শিবলোকস্থিত কোন এক

নিভৃত স্থানে একদা মহাদেব পার্বতীকে ভাগবত-কথা বলিতেছিলেন। সেই সময় শুকপক্ষীরূপে শুকদেবও তথায় অবস্থান করিয়া ভগবৎ-মুখনিঃসৃত ভাগবত-কথা শুনিতেছিলেন। শিব বলিয়া চলিয়াছেন আর দেবী পার্বতী শুনিতেছেন; তাঁহাদের ধারণারও অতীত যে অন্য কেহ সেস্থলে থাকিতে পারে কারণ, ভগবৎবাক্যের প্রবাদ আছে যে, সম্পূর্ণ ভাগবত-কথার জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হন তিনি অমরত্ব লাভ করেন। সেই সময় ভাগবত-কথা শ্রবণকালে দেবী পার্বতী কোন এক সময়ে নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়েন; যখন হর পার্বতীকে ভাগবত জ্ঞানের কথা বুঝাইয়া বলিতেছিলেন তখন দেবী 'হুঁ, হুঁ' শব্দে বোধগম্য হইবার অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত করিতেছিলেন। দেবী পার্বতী নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়িলে তখন দেবীর পরিবর্তে শুকপক্ষীরূপী শুকদেব 'হুঁ, হুঁ' করিয়া যাইতেছিলেন। সমগ্র ভাগবত-শাস্ত্র বিজ্ঞান বলা হইলে পরে তখন মহাদেবের দেবীর প্রতি লক্ষ্য পড়িলে দেখিলেন যে দেবী ঘুমাইতেছেন। তখন শিবের খেয়াল হইল যে তবে কে এতক্ষণ 'হুঁ, হুঁ' শব্দে বোধগম্যের অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত করিল? হঠাৎ চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ভগবান শংকর পার্বতীর পার্শ্বে শুকপক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা অপাত্রে দান হইল মনে করিয়া তখন কুপিত হইয়া ভগবান শিব শুকপক্ষীকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন। শুকপক্ষী তখন অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল আর শিব-ত্রিশূলও তখন তাহার পিছে ধাওয়া করিতে লাগিল। অবশেষে শুকপক্ষী ব্যাসদেবের আশ্রমে পৌঁছিল। সেই সময় ব্যাসদেবপত্নী বটিকা গণ্ডুষে জলপান করিতে যাইতেছিলেন আর সেই ক্ষণেই শুকপক্ষী বটিকার মুখের ভিতর দিয়া একেবারে গর্ভে প্রবেশ করিয়া গেল। কালক্রমে বটিকা গর্ভবতী হইলেন কিন্তু দ্বাদশবর্ষকাল গর্ভ প্রসূত হইল না। গর্ভস্থ শিশু গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ-বেদ, স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। শিশু গর্ভে অবস্থান করিয়াই স্বাধ্যায় পাঠ করিত। এদিকে মাতা বটিকা দেবীও গর্ভভারে ক্লিন্না হইয়া পড়িলেন। তখন একদিন ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, ''তুমি কে আমার পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছ! তুমি কেন নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? তুমি কি আমার পত্নীকে বধ করিবে?'' গর্ভস্থ শিশু উত্তর করিল —''আমি কে তাহা স্থির বলিতে পারি না। কারণ আমি রাক্ষস, পিশাচ, দেব, মনুষ্য, গজ, তুরগ, কুক্কুট, ছাগ প্রভৃতি রূপে চতুঃ-সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি। বর্তমানে আমি মনুষ্য-যোনিতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমি কোনক্রমে এই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব না। আমি যোগাভ্যাসে রত হইয়া এই গর্ভে বাস করিতেছি, এই স্থান হইতেই আমি মোক্ষলাভ করিব।'' ব্যাসদেব বারংবার বালককে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কাতর অনুরোধে শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। জন্মিয়াই তিনি দ্বাদশ বর্ষীয় (মতান্তরে ১৬শ বর্ষীয়) বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তিনি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতে উদ্যত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে গৃহে অবস্থান করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি সম্মত হইলেন না। ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার পুত্রের গৃহস্থাশ্রম, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ব্যাসদেব কিছুতেই পুত্রকে সংসারাশ্রমে বাস করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। শুকদেব নিবৃত্তি মার্গাভিলাষী হইয়া সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া হিমাচল অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি যখন পর্বতশৃঙ্গাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। শুকদেবও ''ভো'' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তদবধি গিরিকন্দরগুলিতে এবং অন্যান্যস্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার প্রতিশব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। শুকদেব পিতা বেদব্যাস হইতে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণাদি অধ্যয়ন করেন। ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকেই প্রথম ভাগবত বলিয়াছিলেন। শুকদেব হইতে রোমহর্ষণ-পুত্র সূত উগ্রসবা ভাগবত প্রাপ্ত হন এবং তিনি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি অষ্টআশি হাজার ঋষিকে ভাগবত কথা শ্রবণ করান।

ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে কখনোই ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাজ্ঞবোধে দেখা যায় যে পরবর্তী যুগে ভগবান ব্যাসদেব যখন বৈষ্ণবীয় ধারায় শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যের দেহে আবির্ভূত হইলেন তখন শুকদেব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠল নাথ গোঁসাইজী রূপে আবির্ভূত হন। পিতা শ্রীবল্লভাচার্য্য ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় পুষ্টিমার্গস্থিত সাধনার ধারা প্রচলন করেন এবং শ্রীবিট্‌ঠলনাথ পুষ্টিমার্গকে সম্প্রসারণ করেন। তারও পরবর্তী যুগে ১৯শ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান ব্যাসদেব কাশীর ভগবান কিশোরীমোহন রূপে এবং শুকদেব ভগবান কিশোরীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরুদ্রদেবরূপে আবির্ভূত

হন। ভগবান কিশোরীমোহন শ্রীমদ্ভাগবত গীতোক্ত ভক্তিযোগ সংস্থাপন দ্বারা কৈবল্যমার্গ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র 'রুদ্রদেব' জন্ম হইতেই পরমহংস অবস্থাপ্রাপ্ত ছিলেন। ভগবান সর্বদাই রুদ্রদেবকে চোখে চোখে রাখিতেন। রুদ্রদেব কখনো কখনো এদিক-ওদিক চলিয়া যাইতেন আপন খেয়ালে। শ্রীভগবান তখন ব্যাকুলচিত্তে কাশীর পথে ঘুরিয়া, খুঁজিয়া রুদ্রদেবকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতেন। পিতার পুত্রের প্রতি যে দিব্যভাব সম্পন্ন স্নেহ, এমনটি আর অন্য কোন মহাত্মার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ইহা যেন এক জন্মজন্মান্তরের সুদৃঢ় বন্ধন। যখন ভগবান কিশোরীমোহনের দেহত্যাগের সময় হইল তখন ভগবান কিশোরীবাবা তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, রুদ্রকে তিনি ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহাকে তিনি পৃথিবীতে আনিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে রাখিয়া আসিবেন। তাই একই দিবসে প্রথমে রুদ্রদেব দেহত্যাগ করিলেন এবং চারদণ্ড পরে শ্রীভগবান যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। —শ্রীভগবান কিশোরীমোহন ও শ্রীরুদ্রদেবের প্রতি জানাই আমাদের ভক্তিবিনম্র প্রণাম।

।। জয় শুকদেবের জয় ।।

।। জয় শ্রীবিট্‌ঠলনাথ - জয় শ্রীরুদ্রদেব ।।

(সহায়ক গ্রন্থ : মহাভারত, ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ ও বৃহৎ কিশোরী ভাগবত)

— হরি ওঁ তৎ সৎ —

ভ্রমণ

পঞ্চকেদারের পথে পথে

(২)

গৌরীকুণ্ড থেকে শোন-প্রয়াগ হয়ে গুপ্তকাশী, সেখান থেকে পায়ে চলা পথের শুরু। রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে ঢাকা পায়ে-চলা সরু পথ। উৎরাই পথে কালীগঙ্গার তীরে নেমে যাই। কালী গঙ্গার বুকে কাঠের সেতু পেরিয়ে গভীর বন। বাঁহাতে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি পদচিহ্ন। পাহাড়ী মানুষের ধারনা ওইগুলি দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের পদচিহ্ন। নিভৃত অরণ্যে পাহাড়ের গায়ে স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখে সত্যিই অবাক লাগে। তর্কের অবতারণা না করে এগিয়ে যাই। বনের গভীরতায় সূর্য্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধ্যানমৌন সুউচ্চ দেওদার, পাইন, ফার ও নাম-না-জানা অসংখ্য মহীরুহ অরণ্যের নীরবতা বজায় রাখে। মাঝে মাঝে পাখীর কলতান, ঝরা পাতার খসখস আওয়াজ, কাঠবিড়ালির ওঠানামা দৃষ্টি কেড়ে নেয়। হিমালয়ের বুকে প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি রূপ বদলায় রঙ বদলায়। জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ সোজা উঠেছে কালীমঠে। দূর থেকে ছবির মতো দেখায়।

কালীমঠ

বিকেল পাঁচটা। এসে পৌঁছাই হিমালয়ের নির্জন পরিবেশে কালীমঠে। পাশাপাশি কয়েকটি সুপ্রাচীন মন্দির। দূরে দূরে স্থানীয় আদিবাসীদের শ্রীহীন ঘরবাড়ি। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষজন। কিশোর কিশোরী, তরুণ-তরুণীর মৌন অভ্যর্থনা, ছোটো শিশুর হাতছানি। কালী-গঙ্গা ও সরস্বতী-গঙ্গার মিলন ঘটেছে কালীমঠে। মন্দির কমিটির ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা হয়।

অতীতে কালীমঠে নরবলির নিয়ম ছিল। গ্রামের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে দেবতার নিকট বলি দেওয়া হত। ক্রমে ক্রমে গ্রামে জন্মহার কমে যায়। কেউই সন্তানধারণে সাহস পায় না। একবার এক বৃদ্ধার একমাত্র নাতনীর পালা পড়ে। গ্রামের ঐ শিশুকন্যা সর্বকনিষ্ঠ বিবেচিত হয়, কিন্তু বৃদ্ধা নাতনীকে ছাড়তে রাজী হন না। নাতনীর বদলে বৃদ্ধা নিজেকে বলিদানের জন্য প্রস্তুত করেন। অষ্টমী পুজোর দিন বৃদ্ধার স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পূজারী উৎসর্গ মন্ত্র পাঠ করেন। অন্যদিকে শিশুকন্যার অর্তনাদে দেবতার হৃদয় বিগলিত হয়। মাতৃহীনা কন্যার আর্তনাদে দৈববাণী হয়। পূজারী হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন, চৈতন্যহীন পূজারীর মুখ থেকে নরবলি বন্ধের নির্দেশ আসে। বৃদ্ধার জীবন রক্ষা পায়। দ্বিতীয়বার দৈববাণীতে ছাগ ও মহিষ

বলির আদেশ হয়। সেই থেকে কালীমঠে মহাষ্টমী পুজোর দিন ছাগ ও মহিষ বলি হয়। বছরে এই একটি দিন গর্ভমন্দির পরিষ্কারের নিয়ম প্রচলিত। ঐ দিন গভীর রাতে পূজারী চোখ বাঁধা অবস্থায় সুড়ঙ্গ মুখের ঢাকনা অপসারণ করেন। পূজারী স্বহস্তে অভ্যন্তর পরিষ্কার করেন। ওই সময় তিনি অভ্যন্তরে দেবীমূর্তি স্পর্শ করেন। প্রবাদ আছে যে পূজারী দেবী মূর্তি দর্শনের চেষ্টা করলে দৃষ্টি হারাবেন। অতীতে এরকম ঘটনা ঘটেছিল বলেও শোনা যায়। তারপর থেকে কোনো পূজারী বাঁধা চোখ খোলার সাহস পান না।

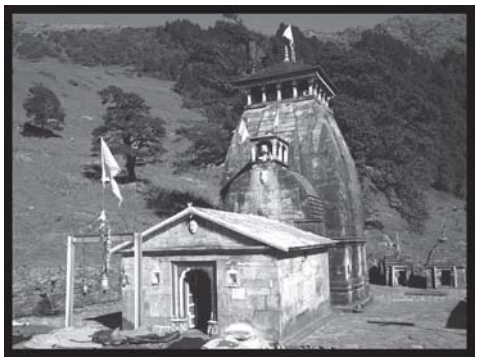

মদমহেশ্বর মন্দির

একরাত কালীমঠে কাটিয়ে ফের পথে নামি। সরস্বতী-গঙ্গার পুল পেরিয়ে ডানদিকের পথ ধরি। বামপাশে গভীর বন। ডানদিকে মদমহেশ্বর গঙ্গা। বাহারি অববাহিকা পথ। মাঝে মাঝে চড়াই-উৎরাই। মাঝে মাঝে ভাঙা পথ। পি.ডব্লু.ডি-এর লোক মেরামতির কাজে ব্যস্ত। কালীমঠ থেকে তিন ঘন্টার রাস্তা লেঙ্ক। পাহাড়ী জনপদ, রাস্তা থেকে সামান্য নীচে সমতল ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়। লেঙ্ক থেকে চড়াই পথের শুরু। আরও তিন কিলোমিটার পথ চলার শেষে উনিয়ানা গ্রাম। এগিয়ে চলি। আরও আট কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসে পৌঁছাই রাঁশু। উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। হিমালয়ের এক সুপ্রাচীন বসতি। প্রাচীন পাহাড়ী গ্রাম, প্রায় সব বাড়িই কাঁচা। গ্রামের মাঝে দেবী রাকেশ্বরী মাতার মন্দির। মন্দিরের পূজারী তাঁর নিজের বাড়িতেই একরাতের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন ভোর হতেই ফের পথে নামা, সামনে আরও এক পাহাড়ী গ্রাম গৌভার। সেখান থেকে বানতৌলী। দূরত্ব এক কিলোমিটার। বানতৌলীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলি। চার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে এসে পৌঁছাই নানু। সামনে আর পাঁচ কিলোমিটার পথ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পাট সেরে এগিয়ে চলি। সামনের পাঁচ কিলোমিটার পথ শুধুই চড়াই আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। গভীর বনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। ইয়াক, বুনোমহিষ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করে। মানুষের উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়েই পথ ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। অস্তমিত সূর্য্যের আলোয় মদমহেশ্বর আর চৌখাম্বার তুষার শিখরে লালচে প্রলেপ। প্রকৃতির সবুজ অঙ্গে রক্তিম আবরণ। সকল ক্লান্তির অবসান। গোধূলিতে মদমহেশ্বর আঙিনায় দেবদর্শন। মদমহেশ্বর মন্দিরের দুটি অংশ, সম্মুখ ভাগের মধ্যস্থানে নন্দীমূর্তি, বামহাতে গণেশজী, ডানদিকে বীরভদ্র ও অসংখ্য মূল্যবান বাসনপত্র। পশ্চাৎভাগে মূল মন্দির ও গর্ভমন্দির। গর্ভগৃহে ধাতু নির্মিত লিঙ্গমূর্তি, পদতলে শীলামূর্তি। প্রবেশদ্বারের ভিতরে, ডানদিকে রাখা কারুকার্যমণ্ডিত ডুলি। শীতকালে দেবতার লিঙ্গমূর্তি এই ডুলিতে চাপিয়ে উখিমঠে নামিয়ে আনা হয়। মূল মন্দিরের পিছনে আরও ছোটো দুটো মন্দির, তার একটিতে গৌরীশঙ্কর যুগলমূর্তি অন্যটিতে পার্বতী মূর্তি। মন্দির চত্বরে দুটি শীতল কুণ্ড — প্রথমটি স্নানকুণ্ড, দ্বিতীয়টি সারদাকুণ্ড। মন্দিরের পূজারীজীর কাছে শুনি মদমহেশ্বরের কাহিনী—বর্তমানের সবুজ প্রান্তর আগে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল, আরবীয় বণিকরা এই অঞ্চলকে তাদের গোচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করত। একসময় একটি দুগ্ধবতী গাভী হঠাৎ দুগ্ধ প্রদান বন্ধ করে দেয়। গাভীটির দুধ না পেয়ে মালিক গাভীটিকে অনুসরণ করেন। দেখেন গাভীটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে একটি শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে দুধ ঢেলে দিচ্ছে । ওই দৃশ্য দেখে বণিকটি রেগে গিয়ে একটি প্রস্তর খণ্ড দিয়ে গাভীটিকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। দৈবক্রমে বণিকের ছোঁড়া প্রস্তরখণ্ডটি ওই শিলামূর্তিতে লাগে, গাভীটি লাফিয়ে প্রাণরক্ষা করে আর শিলামূর্তিটি বেঁকে যায়। সেই রাত্রে বণিকের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। বণিক ওই শিলামূর্তির উপর মন্দির নির্মাণ করে দেবতার পূজা প্রচলন করেন। গল্প শুনে বাইরে আসি। দেখি শুরু হয়েছে তুষারপাত। ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়ে। পরদিন খুব ভোরে বাইরে এসে বাক্‌রহিত হয়ে যাই। গোটা মন্দির চত্বর শ্বেতবরণ আবরণে আবৃত। চৌখাম্বা, মদমহেশ্বরের তুষারধবল গায়ে লালের প্রলেপ। আবার পথে নামা। শুরু পথচলা, এবার গন্তব্য তৃতীয় কেদার — তুঙ্গনাথ। গাড়োয়াল হিমালয়ের সর্বোচ্চ গুহামন্দির। দ্বিতীয়ের দর্শনান্তে তৃতীয়ের সন্ধানে যাত্রা।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(১০)

ভূতনাথবাবুর বাটী ত্যাগ, পৈতৃক ব্যবসা, স্যার হাবার্ট হোমউড ও ধর্ম্মকথা —

দীক্ষান্তে মাণিকলালের জীবনের সমগ্র কর্ম সমাবেশ স্মৃতির মধ্যে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। অন্তরস্থ চৈতন্যে সদাসর্বদাই পরম আরাধ্য গুরুদেবের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের দৈবস্পর্শে যে তাঁহার ব্রহ্মতালুদেশ ঊর্দ্ধমুখে স্ফীত হইয়া শিবলিঙ্গ সদৃশ হইয়াছিল মনে হয় এই সকলের তাহাই কারণ ছিল। মাণিকলাল স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতীব বিনীত চিত্তে তাঁহার আশ্রয়দাতা ভূতনাথবাবুর অনুমতি ভিক্ষা করিলে, ভূতনাথবাবু অতিশয় বিষাদগ্রস্ত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। স্নেহশীল ভূতনাথবাবু মাণিকলালকে তাঁহার প্রস্তাব পরিহার করিবার জন্য কাতরভাবে আবেদন করিলেন এমন কি — তাঁহার অর্জিত স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ মাণিকলালের নামে উৎসর্গ করিবার প্রস্তাবও তিনি দিলেন কিন্তু মাণিকলাল তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল। সাধক ভূতনাথবাবু তাঁহার জীবনের অন্তিমকাল যে সমাগত তাহা উপলব্ধি করিয়াই মাণিকলালকে বলিলেন যে ''তুমি চলে গেলে আমার জীবনাবসান হবে।'' একদিকে আশ্রয়দাতা সাধকের জীবনরক্ষা, অপরদিকে অন্তরে গুরুর আদেশ মাণিকলালকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু সত্য অতীব কঠোর ও নির্মম। ঁগিরীশ ঘোষের কথায় 'মমতাবিহীন হরি'। হরি যেরূপ তাঁহার আশ্রিত দাসের কর্মধারাও তাঁহার কর্মের অনুগমন করে। অগত্যা ভূতনাথবাবুর আলয় ত্যাগে মাণিকলালের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহাকে চুঁচুড়াস্থ বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল আর তাঁহার বিচ্ছেদে ব্যথাতুর ভূতনাথবাবু অচিরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল তাঁহার চুঁচুড়াস্থ পৈতৃক আলয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থকরী কোন কর্মের সংস্থান তাঁহাকে করিতে হইবে এই চিন্তাই মুখ্যতঃ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিশেষতঃ সংসার বিষয়ে উদাসীন পিতা শ্যামাচরণের নিয়মিতভাবে সাধুসঙ্গে কালক্ষেপনের ফলে সংসারের অবস্থা অস্বচ্ছল পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া ছিল। অন্যান্য ভ্রাতাগণ তখন সকলে নাবালক। কানু (খানা) জংশনে থাকাকালীন একজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশন মাষ্টারের (মিঃ টার্ণার) সহিত মাণিকলালের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটিয়াছিল। টার্ণার সাহেব ছিলেন অপুত্রক এবং পুত্র সদৃশ মাণিকলালের ঈশ্বরভাবে তিনি সদাই বিমুগ্ধ থাকিতেন। তৎকালে ধানবাদ ঝরিয়ার কোলিয়ারী অঞ্চলে, মালপত্রাদি পরিবহণের জন্য মাত্রানুযায়ী যানবাহনের অভাব থাকায় মাণিকলালকে সঙ্গে লইয়া সেখানে ট্রানসপোর্ট ব্যবসা শুরু করিবার বাসনা টার্ণার সাহেবের ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার অবসর গ্রহণের চার বৎসর বাকী, অগত্যা তাঁহার পরিকল্পনা রূপায়ণের বিলম্ব ছিল বলিয়া, তাঁহারই সুপারিশে মাণিকলাল তখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং-ক্লার্কের পদে যোগদান করেন। কিন্তু সেই কর্মে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিরতি লইতে হইল। প্রথম জীবনে রেলের খালাসী সতীশ পাণ্ডে (গিরি) তখন তারকেশ্বরের মন্দিরের প্রধান মোহন্তের আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার হীন মনোভাব ও অমানবিক আচরণে বাবা তারকেশ্বর দর্শনাভিলাষী পুণ্যার্থীরা অতিশয় সন্ত্রস্থ থাকিতেন। ঐ স্থান ত্যাগের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে মাণিকলাল ঐ চাকুরী পদে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া পিতামহের ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মণি-মুক্তাদি সংক্রান্ত ব্যবসা চালাইবার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত জহুরীর বিদ্যা ও আর্থিক সঙ্গতি, যাহার কোনটাই মাণিকলালের ছিল না। তাছাড়া ঐ ব্যবসায়ের লেনদেন যে স্তরের লোকদের অর্থাৎ রাজা মহারাজা ও ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই মহলে মাণিকলালের পরিচিতিরও ছিল অভাব। এই কারণে তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া পূর্ব পরিচয় দিয়া তাঁহার পিতামহের বন্ধুপ্রবর রাজা বদ্রীদাসের শরণাপন্ন হন ও পিতামহের ব্যবসা পুনরায় শুরু করিবার মানসে তাঁহার উপদেশ ও যথাযোগ্য সাহায্য ভিক্ষা করেন। রাজা বদ্রীদাসের স্বদেশ হইতে ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আগমণ, মাণিকলালের পিতামহ কালীচরণের সহিত পরিচয়, তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠালাভ ও স্বদেশে রাজা মহারাজা ও ধনিক গোষ্ঠীতে এমন কি বিদেশে বিশেষ ক্রেতা মহলে কালীচরণের অবাধ

যাতায়াত ও যোগসূত্রের বিষয়ে তিনি মাণিকলালকে অবহিত করেন। কালীচরণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের ফলে তাঁহার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসার শোচনীয় পরিণতির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন রাজা বদ্রীদাস। মাণিকলালের আবেদনক্রমে তিনি মাণিকলালকে তাঁহার পিতামহের ব্যবসায়ের কিছু গ্রাহকবর্গের ঠিকানা ও তাঁহাদের নিজস্ব ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য মণি-মাণিক্যাদি দিয়া কমিশনে কাজ চালাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। মণি-মাণিক্যের আদান প্রদান সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশও তিনি দিলেন মাণিকলালকে। বদ্রীদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা পরবশ হইয়া, তাঁহার নির্দেশিত ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবার মানসে মাণিকলাল তখন কলিকাতায় বেনেটোলা বস্তীতে মাটির মেঝে বিশিষ্ট একখানি ঘর মাসিক বার-আনা ভাড়ায় বন্দোবস্ত লন। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাকে অর্থোপার্জনের প্রয়াসে লিপ্ত থাকিতে হইত ঠিকই কিন্তু কর্মের ফাঁকে ও অবসর সময়ে পরমারাধ্য গুরুজীর চিন্তায় বিভোর থাকায় বিরতি তাঁহার জীবনে ছিল না।

বদ্রীদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঠিকানা লইয়া তাঁহারই প্রদত্ত হীরা, মুক্তা, জহরৎ লইয়া মাণিকলাল রাজা মহারাজাদের বাটী ও প্রাসাদে যাইতে শুরু করিলেন। ঐ সমস্ত মূল্যবান দামী জড়োয়ার গহনা অন্দর-মহলের রাণীমা ও রাজকুলবধূদের পছন্দের জন্য স্টেটের দেওয়ান অথবা নির্ভরযোগ্য কোন পদস্থ কর্মচারীর নিকট সম্পূর্ণ মৌখিক বিশ্বাসে গচ্ছিত রাখিতে হইত। যদি তছরূপ হয়, এই আশঙ্কা মাণিকলালের রাত্রির নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইত। গুরুকৃপায় যদ্যপি এই ধরণের ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু ঐ দ্রব্যাদি সমূহের অতি অল্প অংশই বিক্রয় হইত এবং তৎকারণে কমিশন বাবদ যাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটিত তাহা ছিল নিতান্তই অল্প, যাহার দ্বারা তাঁহার সংসারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কোন প্রতিকার তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাধুসঙ্গপ্রিয় মাণিকলালের পিতা মধ্যে মধ্যে সাধুদের আশ্রম হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, এমন কি সময় সময় সুযোগমত তিনি বেনেটোলার বসত বাটীতে পুত্র মাণিকলালের সহিত রাত্রি যাপন করিতেন। মাণিকলালের ব্যবহৃত ঐ বাটীটি যে ভৌতিক প্রভাবদুষ্ট তাহা তাঁহার পিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রায়ই রাত্রিতে দরজায় অবিরাম টোকা দেওয়ার শব্দ শ্রুতিগোচর হইত, দরজা খুলিলে কিন্তু কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইত না। দরজা বন্ধ করিলে পুনরায় টোকা মারার শব্দ হইত। শুনিয়াছি মাণিকলালের পিতা মন্ত্রবলে পুত্রের ব্যবহৃত কক্ষটি দোষমুক্ত করিয়াছিলেন। দৈবভাব ও দৈবচিন্তায় তন্ময় মাণিকলালের ঐ সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের শিষ্য,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৫২ : প্রকৃত আনন্দ কি? আনন্দের উৎস কোথায়? আনন্দকে লাভ করিতে হইলে করণীয় কি?

উত্তর : 'আনন্দ' আত্মবোধের শুদ্ধ অভিব্যক্তি। সেই আনন্দকে পাইতে হইলে যোগ-এর উৎস কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। চেষ্টাই সাধনা। 'যোগ' লাভ হয় আত্মায় বা আত্মচৈতন্যে; যেখানে বিরাটের সন্ধান লাভ করিয়া অনন্তবোধের আস্বাদনে সত্তা আনন্দে আত্মহারা হন।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা আছে। সমুদ্রে যখন ভাঁটা আরম্ভ হয় তখন সব নদীর জল সাগর পানে চলিতে থাকে। অবশেষে সাগরেই গিয়া মিশে বা বিশ্রামলাভ করতঃ স্থিতি পায়। নির্মল হৃদয়ে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, তখনই ভগবানের চিন্তন, মনন, ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহারই সংস্পর্শে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হয়। যতই তাঁহার পানে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাঁহার আকর্ষণ অনুভবে টের পাওয়া যায়। তখন সাধক বোধ করিতে আরম্ভ করেন যে শ্রীভগবানও যেন সাধকের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। ভক্ত সাধক না হইলে যেন শ্রীভগবানেরও চলে না। তখনই শ্রীরাধিকার ন্যায় সব ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া যায় এবং ভক্তসাধক-যোগী তখন ভগবৎসত্তার সংস্পর্শলাভ করিয়া নিজের আত্মসত্তার অস্তিত্বকে ধন্য বোধ করেন। শ্রীভগবানই প্রকৃত আনন্দের উৎস। তাঁহাকে জানিয়া, সগুণে-নির্গুণে তাঁহার সঙ্গে যোগ সঠিক রাখিতে পারিলেই আত্মযোগে উপনীত যোগীসাধক উপলব্ধি করিতে পারেন যে সত্তার ভিতর হইতে কত শক্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ, পরমানন্দ সব ফুটিয়া বাহির হয়। ইহাই পরমেশ্বরের পরম আনন্দ বিভূতি।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ — (*পূর্ব প্রকাশিতের পর....*)

এক্ষণে তুমি যে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অনুভব করিতেছ, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। জাগ্রত অবস্থায় তোমার উত্তমরূপে জ্ঞান থাকে। তখন তুমি বাহ্যবস্তু সকলকে জানিতে পার, তখন তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম তেজস্বী থাকায় বহির্বস্তু সকলকে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া গ্রহণ করে। তোমার স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সেরূপ ক্রিয়া থাকে না, তাহারা অর্দ্ধলুপ্তাবস্থায় থাকে। স্বপ্নে যে সকল বিষয়গুলি দেখ, তাহা নিদ্রাভঙ্গে অলীক বলিয়া বুঝ। স্বপ্নের বিষয়গুলি মিথ্যা হইলেও এক এক প্রকার স্বপ্নের এক এক ফল আছে, তাহা নানা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এক্ষণে সুষুপ্তি অবস্থা কি তাহা বুঝ। ঐ সময় তোমার দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে কোন বোধই থাকে না। এমন কি তোমার অস্তিত্ব আছে তাহারও বোধ থাকে না। সুষুপ্তি ভাঙার পর তোমার স্মৃতি থাকে যে তুমি সুখ অনুভব করিতেছিলে। যদি সুষুপ্তিকালে তোমার সুখের প্রত্যক্ষানুভূতি না হইয়া থাকে, তবে নিদ্রাভঙ্গে সুখের স্মৃতি কিরূপে থাকে? যাহার প্রত্যক্ষানুভূতি নাই তাহার স্মৃতিও নাই। প্রত্যক্ষরূপে পূর্বে যাহা অনুভব করিয়াছ, তাহারই পরে স্মরণ হয়। সুষুপ্তিকালে জীব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সহ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মে প্রলীন থাকে, এই হেতু তখন চেতনা প্রদীপ্তভাবে থাকে না, ক্ষীণভাবে থাকে। এক্ষণে দেখ, এই তিনটি অবস্থা পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু তুমি বুঝিতেছ, তুমি এক থাকিয়াও তোমারই এই তিন অবস্থা। এই সকল অবস্থার কোন অবস্থাই তুমি হইতে পার না। কারণ তাহারা পরস্পর বিরোধী। তুমি জাগ্রত অবস্থাপন্ন হইয়া স্বপ্নাবস্থাপন্ন হও না, এইরূপ ইহার মধ্যে যে কোন অবস্থাকে লইয়া অন্যাবস্থাপন্ন হও না। একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যটিকে গ্রহণ কর। তুমি যদি একরূপ বেশ ধারণ করিলে, পরে সেই বেশ পরিত্যাগপূর্বক অন্য বেশ ধারণ করিলে। তোমার বেশ সকলই স্বতন্ত্র, এই সমস্ত বেশের মধ্যে তুমি একই আছ। সেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনের মধ্যে কেহই তোমার অবস্থা নহে। ঐ সকল অবস্থা মধ্যে তুমি একাই। তোমার স্বরূপের রূপান্তর হয় না। যে তুমি জাগ্রদাবস্থার অনুভব করিয়াছিলে, সেই তুমি স্বপ্নাবস্থার অনুভব করিলে এবং সেই তুমি সুষুপ্তাবস্থারও অনুভব করিলে। এই সমস্ত অবস্থার জ্ঞাতা, অনুভবকর্তা তুমি। জড় অচেতনা বুদ্ধি জ্ঞাতা হইতে পারে না। চৈতন্যই জ্ঞাতা হইতে পারে। তুমি জ্ঞাতা বলিয়াই চৈতন্য। তোমার অবস্থান্তর ঘটে নাই। তুমি সদাই বুদ্ধির দ্রষ্টা হইয়া একরূপে আছ। বুদ্ধির সহিত তোমার অনাদি অবিদ্যাপ্রযুক্ত সম্বন্ধ থাকায় বুদ্ধির অবস্থান্তরকে স্বীয় অবস্থান্তর বলিয়া কল্পনা করিতেছ। তুমি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও স্থূলদেহের সহিত মিলিত হইয়া কখনও স্থুলদেহকে 'আমি' বা 'আমার' বলিতেছ। কখনও ত্রিগুণাত্মিকা অচেতন বুদ্ধিকেই 'আমি' বলিতেছ, কিন্তু তুমি ঐ সকলের অতীত চৈতন্য। সাধন দ্বারা তোমার আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে বুঝিবে যে তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নির্লেপ, অজর, অমর, সর্বব্যাপী, চৈতন্য স্বরূপ। ব্রহ্মচৈতন্য সদাই একভাবে আছেন। তাঁহার স্বরূপগত অবস্থান্তর নাই। তবে জীবদেহ মধ্যে ও জড় জগতে তিনি প্রবিষ্ট এবং পরিব্যাপ্ত থাকায় নানা রূপ নানাভাব তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। তাঁহার নানা নামরূপ সংজ্ঞাদি শাস্ত্রে আছে। যথা — পুরুষ, অক্ষয়পুরুষ, উত্তমপুরুষ, আত্মা, পরমাত্মা, দেব, দেবতা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, বসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব পরশিব, পরমশিব, ব্যোম, আকাশ, প্রাণ, মহাকাশ, কালী, গণেশ, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কাল, মহাকাল, ভূমা, হার্দ্দ ইত্যাদি। তিন লিঙ্গেই তাঁহার নাম ব্যবহার আছে। তাঁহাতে কোন লিঙ্গ ভেদ নাই। তাঁহার স্বরূপতঃ রূপ, মূর্তি, আকার, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনের সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি রূপহীন হইয়াও বিশ্বরূপ, মূর্তিহীন হইয়াও অনন্তমূর্তি। শ্রুতি বলিয়াছে, 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যে কর্ণঃ'। চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখেন, কর্ণ না থাকিলেও তিনি শোনেন। তিনি অনন্ত, তাঁহার শক্তি, মহিমা বিভূতিও অনন্ত। তিনি অমূর্ত হইয়াও যখন যে মূর্তি ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই ধারণ করেন ও যখন ইচ্ছা

পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। যাহা অসম্ভব, তাহাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব। তিনি নির্দোষ, পরম কারুণিক, নির্দয়তাশূন্য ও পক্ষপাতিত্বশূন্য। তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তিনি সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী ও সর্বশক্তি সম্পন্ন। তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর ও জীবদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া ইহার নিয়মন করিতেছেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহারই প্রকাশে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত। তিনি কাহারও দ্বারা প্রকাশিত নহেন। যাহা কিছু দেখিতেছ ও জানিতেছ সমস্তই তাঁহারই প্রকাশ। তাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার অতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। এইজন্য শ্রুতি তাঁহাকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলিয়াছেন ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি উক্তি করিয়াছেন। তিনি জীবগণের কর্মফলদাতা এবং তাহাদের উদ্ধারকর্তা। জীবগণ ভক্তিযোগে তাঁহার আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় মুক্তিরূপ পরমপদ লাভ করেন। তিনি শক্তি দ্বারা সমগ্র জগতের ধারণ ও পোষণ করিতেছেন নচেৎ ক্ষণমাত্রে ইহা বিশৃঙ্খল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 'তস্য প্রশাসনাৎ গার্গী, চন্দ্র সূর্যৌ বিধৃতৌ, অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং' ইহা শ্রুতির উক্তি। তিনি সকলের শাসনকর্তা। ইন্দ্র, যম, বায়ু, বরুণ, রুদ্র প্রভতি দেবতাগণ তাঁহার শাসনাধীন থাকিয়া তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছেন। তিনি এই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র অধিপতি। তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। বেদও সমর্থ নহেন। *...ক্রমশঃ*

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

পুরাণ কথা

মহর্ষি মুদ্‌গল

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অজমীঢ় বংশীয় অর্কের পুত্র হর্য্যশ্ব। এই হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্রের অন্যতম হইলেন 'মুদ্‌গল'। এই ঋষি মুদ্‌গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া 'মৌদ্‌গল্য' নামে অভিহিত হন।

মহর্ষি মুদ্‌গল দক্ষিণ-সমুদ্র তীরবর্তী ফুল্লগ্রামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ভগবান নারায়ণ ঐ যজ্ঞের হবিঃ ভোজন করিবার জন্য ভগবতী লক্ষ্মীদেবীসহ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যজ্ঞের হবিঃ পান করিয়া অতিশয় তুষ্ট হন। অতঃপর ভগবান বিষ্ণু মুদ্‌গলকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মুদ্‌গল বলিলেন — ''আমি প্রত্যহ দুইবেলা এইস্থলে যজ্ঞাগ্নিতে দুগ্ধ দ্বারা হোম করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করুন।'' তখন ভগবান সুরভীকে ডাকিয়া বলিলেন, ''আমার এই ভক্ত প্রতিদিন এস্থলে দুগ্ধ দ্বারা হোম করিবেন। সেইজন্যে আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি প্রত্যহ এখানে আসিয়া তোমার দুগ্ধ দ্বারা এই সরোবর পূর্ণ করিবে।'' ইহার পর হইতে মুদ্‌গল প্রত্যহ দুগ্ধ দ্বারা নারায়ণের উদ্দেশ্যে হোম সম্পাদন করিতেন। এইভাবে বহুবর্ষ অতীত হইলে পর মরণান্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থলে আছে এই মহর্ষি মুদ্‌গলকে লইয়া আরও একটি কাহিনী। — কোনও সময়ে মহর্ষি মুদ্‌গল অর্ব্বুদ পর্বতে নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিল — ''দেবরাজ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।'' ইহাতে মুদ্‌গল বলিলেন —''আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি মর্ত্যে থাকিয়াই মহেশ্বরের আরাধনা করিব।'' তখন দেবদূত নানারূপে মুদ্‌গলের নিকট স্বর্গলোকের মাহাত্ম্য ও শোভা বর্ণনা করিল কিন্তু তাহাতেও মুদ্‌গল স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তখন দূত স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট বলিল। দূত একেলা ফিরিয়া আসায় ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুদ্‌গলকে যেমন করিয়াই হউক স্বর্গে লইয়া আসিবার জন্য পুনরায় দূতকে আদেশ করিলেন। ইন্দ্রাদেশে দূত পুনরায় মুদ্‌গলের সমীপে গমন করিলে মহর্ষি মুদ্‌গল তপঃপ্রভাবে তাহার গতি স্তম্ভিত করিলেন। এদিকে দূতের বিলম্ব দেখিয়া দেবরাজ স্বয়ংই অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং মহর্ষি মুদ্‌গলের আশ্রমের নিকট আসিয়া দূতকে স্তম্ভিত দেখিতে পাইলেন। তখন পুরন্দর অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মুদ্‌গলকে বধ করিবার জন্য বজ্র লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহর্ষি মুদ্‌গল কেবল দৃষ্টিপাত করিয়াই বজ্রধারী ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া মুদ্‌গলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। অতঃপর দেবরাজ প্রত্যাবর্তন করিলে, মুদ্‌গল ঋষি পূর্বের ন্যায় ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালক্রমে মোক্ষলাভ করিলেন।

মোক্ষপ্রাপ্তগণই বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। স্বর্গ অপেক্ষা মোক্ষপদ শ্রেষ্ঠ। এই উপাখ্যান দ্বারা জগতের সাধকযোগী স্বরূপ মুনি-ঋষিগণ ইহাই শিক্ষালাভ করিবেন।

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৩)

মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুরক্ষতি পার্ব্বতি।। ৭২

হে পার্বতি, মুনিভিঃ বা পন্নগৈঃ যদি বা সুরৈঃ অপি (কশ্চিৎ পুরুষঃ) শাপিতঃ (ভবেৎ) বা (অথবা) (সঃ পুরুষঃ যদি) কালমৃত্যুভয়াৎ (আক্রান্তো ভবেৎ), (গুরুভক্তং তং পুরুষং) গুরুঃ (সদৈব) রক্ষতি।।৭২

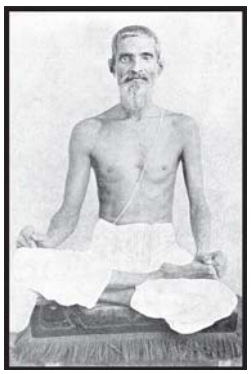

মুনি (অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মধ্যানে যিনি আছেন), পন্নগ (অর্থাৎ সর্প যাহারা অবিলম্বে মৃত্যু আনয়ন করে); সুর (অর্থাৎ সুরলোকবাসী দেবতা); ইঁহারা যদি রুষ্ট হইয়া গুরুভক্ত পুরুষের প্রতি শাপ প্রয়োগ করেন, সেই গুরুভাবাপন্ন পুরুষকে গুরুই শাপফল হইতে রক্ষা করেন (কারণ গুরুর প্রতি শাপ প্রযুজ্য হয় না); অথবা কালস্বরূপ মৃত্যুভয় হইতেও গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন।। ৭২

গুরুভক্ত জীব গুরুপ্রসাদে গুরু হইয়া যান, এবং দেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া দেহাতীত অবস্থা লাভ করেন। মৃত্যুভয়াদি অশুভ ঘটনা দেহসম্পর্কেই হইয়া থাকে, যাহার দেহ আছে সে ব্যক্তিই দেহের শুভাশুভ ঘটনায় স্বয়ং লিপ্ত বুঝিতে হইবে, এবং যাহার দেহ নাই, তাহার আবার শুভাশুভ কি হইতে পারে? সুতরাং সে ব্যক্তি শাপফল অতিক্রম করিয়াছে, দেহেরই মৃত্যু হয়, যাহার দেহ নাই, তাহার মৃত্যু ভয়ই বা কেন হইবে?

অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণা ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ।। ৭৩

সর্ব্বে সুরাঃ অশক্তাঃ, তথা সর্বে মুনয়ঃ অশক্তাঃ হি (নিশ্চিতং), গুরুশাপহতাঃ সন্তঃ ক্ষীণাঃ, (তে) ক্ষয়ং যান্তি, (অত্র) সংশয়ঃ ন (নাস্তি)।। ৭৩

পরন্তু কি মুনিগণ, কি সুরগণ সকলেই অশক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, (কারণ মুনিগণের অবলম্বন-চ্যুতিতে পতনের আশঙ্কা আছে, এবং সুরগণেরও জগতের সম্পর্কে আসিয়া স্বর্গচ্যুতির সম্ভাবনা আছে), ইঁহারা গুরুশাপগ্রস্ত হইলে ক্ষীণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই।। ৭৩

মুনি প্রভৃতি সকলেই যতক্ষণ না গুরুতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাদের দেহধারী বলিয়া বুঝিতে হইবে; আত্মসমর্পণ হইলে গুরু ভাবাপন্ন হইবেন, তখন শাপ অথবা মৃত্যুভয় নাই।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎপরং পদম্।। ৭৪

হে দেবি, গুরুরিতি অক্ষরদ্বয়রূপম্ ইদং পদং মন্ত্ররাজং, শ্রুতিবেদান্ত বাক্যেন (কথিতং), গুরুঃ সাক্ষাৎ পরংপদম্ (এব জানীহি)।। ৭৪

গুরু এই পদটি 'গু' এবং 'রু' দ্বি-অক্ষরে গঠিত, ইহাই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ। মন্ত্র অর্থাৎ, মনের উদ্ধারের কারণস্বরূপ বলিয়া ইহাকে মন্ত্র বলা হয়, অর্থাৎ মন অন্ধকারময় জগতে পড়িয়া আছে এবং তাহার উদ্ধারের হেতু হইতেছেন গুরু। গুরুস্থান ঊর্দ্ধে আছে, উহাই পরম পদ বলিয়া কথিত হয় - শ্রেষ্ঠত্ব হেতু উহা পরম, অন্ধকারের পরপারে উহার স্থিতি আছে বলিয়া উহা পরমপদ বলিয়া কথিত হয়। গুরুর অস্তিত্ব সর্বত্রই আছে, তথাপি তিনি স্বস্থানচ্যুত হয়েন না, যেমত সূর্য্য ও সূর্য্যের আলোক — সূর্য্যের আলোকস্বরূপ রূপ সর্বত্রই আছে, তথাপি সূর্য্য কখনও স্থানচ্যুত হয়েন না। সূর্য্য স্থিরভাবে আছেন, পরন্তু জগৎ ঘুরিতেছে, জগতের জীবও জগতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, সুতরাং সে সূর্য্যের উদয়াস্ত অনুভব করিতেছে; যতক্ষণ সূর্য্য সমীপে, ততক্ষণ সে সূর্য্যালোক অনুভব করিতেছে, যখন জগৎ ব্যবধানস্বরূপ হইয়া সূর্য্য তাহার অন্তরালে পড়িল তখনই সে অন্ধকারময় জগতের মধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকে। সূর্য্যস্বরূপ গুরুর রূপ আলোকস্বরূপ হইতেছে, সে কারণ তাঁহাকে শাস্ত্রে জ্যোতির্ময় বলিয়া থাকে, সেই আলোক অবলম্বনে যাহার সূর্য্যপদে গতি হয়, তাহার আর অন্ধকারের অনুভূতি নাই, সে চিরকালব্যাপী

আলোকে থাকিয়া যায়, ইহাকেই জীবের উদ্ধার বলে, অর্থাৎ জীব তখন ঊর্দ্ধগামী হইয়া দৃষ্টির অন্তরায়-স্বরূপ জগতের ব্যবধান কাটাইল, সুতরাং তাহার উদ্ধারসাধন হইল। আলোক সহ অন্ধকার মধ্য দিয়া জীবের গতি হইতেছে, জীবের ওঁকারধ্বনি (নাদশ্রুতি) শ্রুতিগোচর হইতেছে, উহা জীবকে প্রবুদ্ধ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে এবং বলিতেছে ''জীব দেখ, ইহাই অন্ধকার, এবং এইখানে তুমি আবদ্ধ আছ; উপরিভাগে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব রহিয়াছেন, উঁহারই আলোকে তোমার জ্ঞান হইতেছে যে, ইহা অজ্ঞান এবং উহা জ্ঞান, এবং উঁহারই অনুগ্রহে তুমি অন্ধকারময় জগতে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছ।'' এই ভাবে সূর্য্য- দেবকে দেখিতে দেখিতে জীব অন্ধকারময় জগৎ অতিক্রম করিল; জীবের জগৎরূপ আবরণ ঘুচিল, সুতরাং জানা শেষ হইল, জীব সূর্য্যালোকে স্থিতিসম্পন্ন হইল। ইহাই বেদ ও বেদান্তের অবস্থা, যাহা বেদ ও বেদান্তবাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে কথিত হয়। উহা অনুমানে, নহে পরন্তু সাধনকর্মের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায়, এবং প্রত্যক্ষে বুঝা যায় বলিয়াই গুরুই সাক্ষাৎ পরমপদ। সে পদের সাক্ষাৎ হইয়া জীব কি বুঝিল? —সে বুঝিল যে অপ্রকাশ গুরুই এই পদরূপে প্রকাশমান হইয়া আছেন। ৭৪ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

১০। (পত্র নং ১০, প্রঃ ২)—(প্রথম ভাগ) ....গুরুদেব কৃপাযুক্ত ১০৮ ছিলেন। ইহাই অনন্তভাব। কিন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের অন্ত বা ৮-এর অন্ত হইয়া ১০৯-এ প্রবেশ হইয়াছে। এইজন্যেই তিনি পুনর্বার আবির্ভূত হইতে পারিতেছেন। ১০৮-এ যে যোগীর অবসান হয় তাঁহার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হয় না। — এই বিষয়ে শ্রীমার বক্তব্য।

উত্তর — (পত্র ১০, প্রঃ ২, প্রথম ভাগ) — বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব জগতে জীবকল্যাণ ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে সদ্‌গুরু পরম্পরায় স্থূলতনু ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন ছিল, সন্ত সদ্‌গুরুমণ্ডল দ্বারা পরিচালিত 'কৃপাযুক্ত যোগ' সাধনা ও পূর্ণসিদ্ধি। জ্ঞানগঞ্জের যোগ অনুযায়ী তিনি যোগ-চেতনার স্তরের ১০৮-এর পর্য্যায় উন্নীত হইয়া চিদ্ বা পুরুষোত্তম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। এখানেই যোগী বিরাটের অনন্তভাব প্রাপ্ত হন আত্মদর্শন ও আত্মউপলব্ধির মহিমায়। এ অবস্থায় যোগী হন, বিশুদ্ধ গুরু। এখানেই আত্মজ্ঞান-যোগের পূর্ণতা হয়। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দদেব দেহরক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ১০৮-এ অনন্তভাবের চিদাভাসকে ধারণ করিয়া পূর্ণভাবে ছিলেন। তিরোধানের পর তিনি ১০৯-এ প্রতিষ্ঠিত হন। আত্মঅস্তিত্ব বোধে আত্মারূপী পুরুষোত্তমকে জ্ঞাত হইলে অদ্বৈতযোগ সম্পূর্ণ হয় এবং যোগীশ্বর হইয়া যোগী অমরত্ব অর্জন করেন। তখন যোগীর সত্তায় সীমাবদ্ধ কর্ম অসীমে পর্য্যবসিত হইয়া যোগী-সত্তায় অখণ্ডের আভাস জাগ্রত হয়। তখন শুদ্ধবোধের বোধোদয় হয়। এই বিশুদ্ধ বোধ বলিতে 'একটি মহাসত্তার আভাস চৈতন্য মাত্র প্রকট' বুঝিতে হইবে। ছেলেপেলেরা যখন লুকোচুরি খেলে — গুপ্ত ও অজ্ঞাত স্থান হইতে একটি ছেলে যখন 'টু' শব্দ করে, তখন শব্দ ধরিয়া অন্য ছেলে তাহাকে খুঁজিতে থাকে। এই অন্বেষণ করাটাই জ্ঞান বা বোধি। বোধটি নাদরূপী মহানন্দ ব্রহ্মানন্দ শব্দ ব্রহ্মরূপে ১০৮-এ গুরুস্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। যোগী অভাব হইতে আসে, স্বভাবে স্থিতিলাভ করে। ১০৯-এ প্রবেশ মাত্র যোগীসত্তায় অনন্তের অন্ত হইয়া একের ভিতর অনন্তের

সমাবেশ হয় এবং যোগী নবম ভূমিতে আরোহণপূর্বক 'পরমশিব' অবস্থাপ্রাপ্ত হন। পরমশিবের কায়া শুদ্ধসত্ত্বময় কারণ-জ্যোতি দ্বারা নির্মিত জ্যোতির্ময় কায়া। এই অবস্থালাভ হইলে পরে সদ্‌গুরুরূপী পরমশিব নির্বাচিত স্থূলদেহসম্পন্ন 'আধা'র মধ্য দিয়া আবির্ভূত সত্ত্বোর্জিত বিশুদ্ধ দেহে জগতের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হন। বিশুদ্ধানন্দদেব তাঁহার স্থূলদেহ ত্যাগের পরেই এই 'পরমশিব' অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। জগতের হিতার্থ কর্মসম্পাদন করিবার জন্যে ১০৮-এই জ্ঞানগঞ্জের সদ্‌গুরুমণ্ডল তাঁহাকে স্থিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১০৯ হইলে যোগী স্থূলসত্তায় দিব্যকে ধারণ করিতে পারেন। তখন পরাভক্তিযোগে যোগীশ্বর রূপে সদ্‌গুরু আত্ম-কল্যাণের মাধ্যমে জগৎ কল্যাণ স্বতন্ত্রভাবে অভাবনীয় প্রকাশে সংঘটিত করিতে সক্ষম হন। এই যে দেহান্তরে ১০৮ হইতে ১০৯-এ উপনীত হওয়া, ইহাও কৃপাযুক্ত যোগ, নয়তো কৃপাশূন্য যোগে ১০৮-এ যে যোগীর দেহাবসান হয় তাঁহার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভে অণুসম লিঙ্গদেহে আত্মসমাবিষ্ট হইয়া মহাকারণ চেতনায় উপনীত হইবার তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া যান। *—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৬৪)

তখন আমি (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) Cost Accountancy পড়ছিলাম। হাওড়া অনন্তপুরে Posting ছিল। সেই Branch-টা রূপনারায়ণ নদীর ধারে (সিদ্ধেশ্বরী কটন্ মিলের নিকট) অবস্থিত ছিল। মাস খানেক পরে আমার ICWA (Intermediate) পরীক্ষা ছিল, আমি

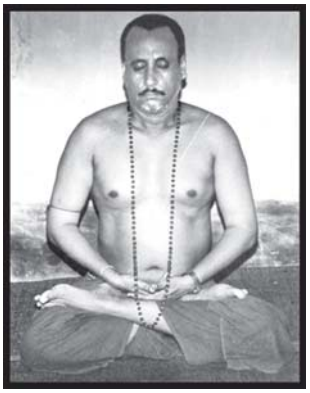

Office-এ দরখাস্ত করে ১০ দিনের ছুটির ব্যবস্থা করলাম। তারপর আমি গুরুদেবের (শ্রীশ্রী সরোজ বাবা) কাছে গেলাম আশীর্বাদ নিতে। গুরুদেব বললেন যে, ''প্রদীপ তোর ছুটিটা বাতিল কর। এ পরীক্ষাটায় তুই ব্যর্থ হবি।'' যেহেতু আমি ছুটির সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম তাই আমি বাতিলের দরখাস্ত করলাম না। যথারীতি preparation চালাতে লাগলাম। সেইবার পরীক্ষায় Computer System প্রথম শুরু হয়েছিল, সেই ব্যাপারে আমার কিছুই ধারণা ছিল না। যদিও পরীক্ষার হলে Instructor-রা Computer ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন কিন্তু আমি nervous হয়ে গিয়ে পরীক্ষা ভাল হওয়া সত্ত্বেও negative marking থাকার জন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলাম।

প্রসঙ্গ (৬৫)

আমি (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) যে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ এবং কড়া ধাঁচের মানুষ। উনি আমাদের গুরুমহারাজের (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) বাড়ীর নিকট থাকতেন, উনি আমাদের গুরুজীর বন্ধু ছিলেন। উনি 'তুলাদা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই মাষ্টারমশাই-এর দাদাও আমাদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি তখন মাষ্টারমশাইয়ের দাদা রিটায়ার হয়ে গিয়েছিলেন ও খুব ভুগছিলেন। বাড়ীর সবাই খুব চিন্তিত ছিল। এই সময় একদিন যখন গুরুর নিকট বসে আছি হঠাৎ গুরুদেব বললেন, ''প্রদীপ, তুলার দাদা দু-এক দিনের মধ্যেই এই পৃথিবীতে আর থাকবেন না।'' সত্যই মাষ্টারমশাইয়ের দাদা দুদিনের মাথাতেই মারা গেলেন। কয়েকদিন বাদে মাষ্টারমশাইকে ঘটনাটা বলতে উনি বললেন, ''দেখো প্রদীপ, ডাক্তারেরা দাদার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারলেন না আর তোমার গুরুদেব সময় বলে দিলেন। এটা কেবল ত্রিকালজ্ঞ ঋষির পক্ষেই সম্ভব।''

প্রসঙ্গ (৬৬)

আমার মা গুরুদেবের (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) গৃহে যাবার কয়েক মাস পরে একদিন গুরুদেবকে বললেন যে তিনি যেন একবার আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলা দেন। গুরুদেব বললেন, ''মা, আমি সামনের রবিবারে সকাল আটটায় তোমাদের বাড়ী যাবো।'' মা তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি

তো আমাদের বাড়ী চেনেন না তাহলে কিভাবে যাবেন? বাবা বললেন ''মা, আমি ঠিক চিনে নেবো।'' সেই কথা শুনে আমাদের সকলের সীমাহীন আনন্দ হল। নির্দিষ্ট দিনে মা যথারীতি ফুল-চন্দন দিয়ে বাবার চলার পথ তৈরি করলেন। এদিকে আটটা বেজে ৯টা বাজতে চলল বাবা এলেন না, মা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন, তারপর ঠিক সকাল ৯টার সময় বাবার গৃহ-আশ্রম থেকে চারজন গুরুভাই সাইকেলে করে এলেন, তারা হলেন - বাপিদা, অসীমদা, মিঠুন এবং অঞ্জন ডাক্তার। মা গুরুভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন ''উনি কখন আসবেন?'' তারা বললেন, ''বাবা আসবেন না, আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বাবা এইভাবে আমাদের বলে দিয়েছেন যে, তোরা দেখবি প্রদীপদের বাড়ী পূর্ব দিকে মুখ করা এবং সামনে বড় সবুজ রং করা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখবি মেঝের উপর চন্দন দিয়ে আঁকা এবং তার উপরে সাদা ও গোলাপী রংয়ের ফুল দেওয়া আছে। তারপর দেখবি কিছুটা গিয়ে ফুলের পথটা উত্তর দিকে ঘুরে গিয়েছে, তারপর আবার পূর্ব দিকে ঘুরে একটা ঘরে ঢুকে গিয়েছে। সেইখানে দেখবি পূর্বদিকে মুখ করে একটা পূজার আসন পাতা আছে, পিলসুজের উপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। একটা কাঁসার থালায় হরেক রকম ফুল রয়েছে।'' আমার গুরুভাইরা এত কথা বললেও আমার মায়ের কানে কিছু প্রবেশ করল বলে মনে হল না। মা প্রথমে খুব রেগে গেলেন ও তারপর বেশ কান্নাকাটি করতে লাগলেন। গুরুভাইরা মাকে বোঝাতে লাগলেন যে ''মা, কিছু চিন্তা করবেন না, বাবা ঠিক সূক্ষ্মদেহে এই আসনের উপর বিরাজ করছেন।'' মা বললেন,''ওসব তোমাদের মন ভোলানো কথা, ওতে আমার বিশ্বাস নেই।''

এবারে বাবার কথায় আসা যাক, বাবা প্রায়ই মহাভাবে থাকতেন যেটা আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে দেখতে পাই, বাবা যেন সব সময় আদ্যাশক্তি মহাশক্তির লীলা এই মহাবিশ্বের মধ্যে দেখতে পেতেন, সেইজন্যে বাবা ভাবের আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কোনো একদিন বাবা হঠাৎ খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন আমাদের গুরুভাই বাবলাদার বাড়ী যাবেন বলে। বাবার বাড়ী বাক্সাড়ায় আর বাবলাদার বাড়ী রামরাজাতলায়, বেশ কিছুটা দূরে। রাস্তার অবস্থা ছিল খুব খারাপ, প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই ভেঙে বড় বড় গর্তে পরিণত হয়েছিল। বাবা ওর ওপর দিয়ে খুব সহজেই হেঁটে চলে গেলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, ''স্বয়ং মা আদ্যাশক্তি দুর্গা রাস্তার ওপর নরম মখমলের চাদর পেতে দিলেন। আমিও তার ওপর দিয়ে মহাআনন্দে চলে এলাম।''

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, একটা ক্লাস ফোর বা ফাইভের ছাত্রের যে বুদ্ধি বা জ্ঞান আছে আমার তাও নেই তবুও আমি আমার গুরুমহারাজের এবং শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপা পেয়ে থাকি।

প্রসঙ্গ (৬৭)

শ্রীশ্রীসরোজবাবার মুখনিঃসৃত নিম্নলিখিত বাণীগুলি একজন উন্নত ক্রিয়াবানের লেখা, কিন্তু তিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। তাঁর কথাতেই লিখছি —

লাহিড়ী বাবা (যাঁকে আমরা দাদা বলে সম্বোধন করতাম) তাঁর অমৃত-কথা এবং উপদেশ—

১) ক্রিয়া নেবার সময় ফুল মালা কম পড়ায় বাবা বলেন — ''বাহ্যিক ফুলের মালা দিয়ে কি হবে, নিজের ফুল ফোটাও তারপর গুরুকে দেবে।''

২) ক্রিয়া সর্বদা রক্ষা কবচ।

৩) তোমাকে যদি ৩০ ক্রোশ পথ যেতে হয় তবে তোমাকেই একা যেতে হবে। আমি কিছু করে দেব না। তবে তোমার পাশে থাকব যাতে তুমি বুঝতে না পারো কি করে তুমি বন্ধুর হাত ধরে এগিয়ে গেলে।

৪) ফুল ফোটাও দেখবে মৌমাছি তোমার কাছে আপনি আসবে, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।

৫) আত্মনারায়ণ সত্তার সব অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন কিন্তু সত্তার ইন্দ্রিয়জ-রিপুজ অহংকার কখনোই ক্ষমা করেন না।

৬) ঘুড়ি যত ওপরে উড়ুক সুতো, লাটাই আমার হাতে, ইচ্ছে মতো ঘুড়ির রং পাল্টে দিলেই হল।

৭) যে আমার দোকানের ঘি একবার খেয়ে ফেলেছে — তাকে আমার দোকানেই আসতে হবে।

৮) যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

৯) আমায় রোজ গোমাংস খেতে হয় (বাহ্যিক গোমাংস নয়) গুরুর কৃপায় জানতে হয়, গুরুমুখী গুপ্ত বিদ্যা।

...ক্রমশঃ

—মাতৃ-পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

অভয়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ষোড়শ অধ্যায়, দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ, প্রথম শ্লোক —

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।।

এই শ্লোকটিতে ভগবান বলছেন, মানুষকে দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে হলে সর্বপ্রথম মনকে সত্ত্বগুণী করে তুলতে হবে। সত্ত্বগুণী হবার জন্য প্রয়োজন নির্ভয়, অন্তর শুদ্ধিকরণ, দান, দম অর্থে সংযম, তপঃ পরায়ণ, স্বাধ্যায় এবং আর্জবম্ অর্থে বাক্যে, ভাবে ও কার্য্যে একরূপ হওয়া।

যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হয়ে মুক্ত পুরুষ হন, তাঁরা প্রকৃতির গুণত্রয়ের সমস্ত রকম গুণের ঊর্ধ্বে পৌঁছান। ত্রিগুণের অতীতে পৌঁছানোই তাঁদের লক্ষ্য - 'নিস্ত্রৈগুণ্যঃ'। তাঁরা ত্রিগুণাতীত হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুণাতীত কেন? কারণ একটি গুণ তার ক্রিয়ার দ্বারা অন্য গুণকে প্রভাবিত করে - ''গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে''। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, জগতের সমস্ত কর্মই প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীনস্থ। কর্মের এই বিধানের অতীত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আত্মার মধ্যে নীরব হওয়া। যাঁরা মুক্ত পুরুষ তাঁরা ভগবানের মধ্যে বাস করেন এবং অধ্যাত্ম সঙ্কল্প নিয়ে কর্ম করেন। অমুক্ত মানুষের মতো সাধারণ সঙ্কল্প-বিকল্প যুক্ত কর্ম করেন না। মুক্তমনা পুরুষের কর্ম প্রকৃতির রজঃগুণের দ্বারা নয়, বরঞ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সংঘঠিত হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অধীন, তাই তাদের পক্ষে গুণাতীত হওয়া একেবারেই দুরূহ ব্যাপার। তাহলে করণীয় কি? প্রবল চেষ্টা ও ইচ্ছার দ্বারা তমঃগুণ থেকে নিশ্চিত বেরিয়ে আসা যায়। সদ্ ইচ্ছা থাকলে রজঃগুণের বৃত্তি সমূহকে মনের দৃঢ়তা এবং কৌশলে ভালো কাজে ব্যবহার করে রজঃ গুণের অভিমুখকে সত্ত্ব গুণের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এইভাবে এই জীবনেই সত্ত্বগুণী হয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

মানুষ বাইরেটা সব সময়ই বেশ পরিষ্কার রাখে, যেমন নিত্য স্নান, প্রসাধনী ব্যবহারের দ্বারা দেহকে সুন্দর রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করা, আপন ঘর-দোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি। এতে মানুষের বাহ্য মন আনন্দ পায়। এগুলির যেমন প্রয়োজন তেমন এইসবের সঙ্গে অন্তরের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিৎ। অন্তর পরিষ্কার না হলে চিরস্থায়ী আনন্দ বা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হবার দিকে একচুলও এগোনো যায় না। অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য ভগবান বললেন, - ''দানম্ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্''। অর্থাৎ সংযমী হতে হবে, দানের দ্বারা সেবাপরায়ণ হতে হবে, শাস্ত্রপাঠ ও সাধনা করতে হবে এবং সর্বোপরি, ভাবনা ও কাজের মধ্যে একরূপ সমন্বয় আনতে হবে।

জীবনে উপরিউক্ত অভ্যাসগুলো রপ্ত করতে হলে যে শব্দটি ভগবান এই শ্লোকের প্রথমেই বলেছেন তা হল 'অভয়ম্' অর্থাৎ নির্ভয় হতে হবে। এই অভয় প্রাপ্ত হওয়া অধ্যাত্ম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভয়ই মানুষকে তিনগুণের দাসত্বে পরিণত করে। ভয় প্রধানতঃ দুই প্রকার, একটি ইতিবাচক (Positive fear), অন্যটি নেতিবাচক (Negative fear)।

ইতিবাচক (Positive) ভয় আবার দুই প্রকার যেমন —

১) চোর, ডাকাত, সাপ অন্যান্য পশু ইত্যাদির থেকে ভয়। যা থাকা স্বাভাবিক এবং এই ভয় জীবন রক্ষার সহায়তা করে। তবে মনে রাখা উচিৎ এই ভয়েরও একটা যেন সীমা থাকে। সীমাহীন এই ভয় মানুষের মানসিক অসুস্থতার কারণ পর্য্যন্ত হতে পারে যাকে আতঙ্ক (Phobia) বলে। সাবধানতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা এই ভয় থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়।

একবার স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণ করতে করতে কাশী-বিশ্বনাথধামে পৌঁছে বিশ্বনাথজীর দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় লক্ষ্য করলেন কিছু বানর ওনার দিকে তেড়ে আসছে, স্বামীজী ভয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। সেই দেখে অন্য একজন সাধু বললেন, —''স্বামীজী দৌড়ো মৎ, উন্‌কো সামনা করো''। তৎক্ষণাৎ স্বামীজী পিছন ফিরে এগিয়ে যেতেই বানরগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, ''ঐ অভিজ্ঞতা আমাকে জীবনের সমস্যার মোকাবিলা করতে শিক্ষা দিয়েছিল। বুঝেছিলাম সমস্যা থেকে না পালিয়ে মুখোমুখী হলে সমস্যার সমাধান হয়।''

২) যদি কর্তব্য কর্ম দ্বারা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়, এইরূপ ভাবা আর একটি ইতিবাচক ভয়। এটা ঠিক যে এইরকম ভাবার

ফলে মাতা, পিতা ও গুরুর আজ্ঞা জড়তার সঙ্গে ভয় ভয় পালন করা হয়ে যায়। কিন্তু এই ভয় থেকেও মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরণের ভয় ও জড়তা থেকে মুক্ত হতে গেলে তৎপরতা, মনযোগ, পরিশ্রম, বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে সঠিকভাবে কর্তব্য কর্ম করে সদাচারী হওয়া যায়।

একবার এক ব্যক্তি ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে গুরু খুঁজতে বেরিয়ে ছিলেন। অনেক সাধুসঙ্গ করে বহু রকম উপদেশও পেয়েছিলেন। সেইসব উপদেশ অনুযায়ী নানান আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্মাদি করেও যখন কিছুই পেলেন না তখন নিরাশ হয়ে বিরক্তি সহকারে পথ চলতে চলতে একজন মহাত্মার সঙ্গে দেখা হল। সব শুনে মহাত্মা বললেন, ''আমি তোমায় ভগবান লাভের পথ দেখাতে পারি কিন্তু একটি শর্তে। তোমায় কথা দিতে হবে যে নির্দ্বিধায় আমার আজ্ঞা পালন করবে।'' ব্যক্তিটি রাজী হলেন। তখন ঐ ব্যক্তিকে মহাত্মা নিজের আশ্রমে নিয়ে এসে বললেন, - ''আজ থেকে এই আশ্রমে যত সাধু, ভক্ত আসবেন তাঁদের সেবা-যত্ন তোমায় হাসিমুখে করতে হবে এবং দিনান্তে সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠের পর নির্জনে নির্ভয়ে একাকী বসে 'আমি কে' এই মন্ত্র জপের সঙ্গে ধ্যান অভ্যাস করতে হবে। সব শুনে ব্যক্তিটি নিঃসঙ্কোচে বললেন,'' 'আমি কে' তা তো আমি জানি, আমার নাম রাঘবেন্দ্র। আমি তো নিজেকে নয়, ভগবানকে জানতে চেয়েছি।'' মহাত্মা তৎক্ষণাৎ নিঃশর্তে আজ্ঞা পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই রাঘবেন্দ্র নির্ভয়ে বললেন, ''ঠিক আছে আপনার আজ্ঞা যথাযথ পালন করব, কিন্তু মনে রাখবেন এক বছরের মধ্যে যদি ভগবানের সম্বন্ধে জানতে না পারি তাহলে আমি আপনার কাছে এই এক বৎসরের পরিশ্রম ও সময় নষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করব।'' মনে মনে মহাত্মা রাঘবেন্দ্রের দৃঢ় ইচ্ছা ও স্পষ্টবাদিতায় খুশী হয়ে বললেন ''তথাস্তু। কিন্তু বৎস মনে রেখ আমার কাজ হল পথ দেখানো আর তোমার কাজ হল দ্বিধা, আলস্য ও জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে নিষ্ঠার দ্বারা সাফল্য অর্জন করা। সবকিছুই নির্ভর করছে তোমার সততা, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতার উপর।'' অবশেষে গুরুমুখী বিদ্যা অর্জন করে রাঘবেন্দ্র কালে আত্মজ্ঞানী হয়েছিলেন।

নেতিবাচক ভয় তিন প্রকার যেমন —

১) অজানা ভবিষ্যতের চিন্তা (Anxiety)। ভবিষ্যতে আমার বা আমাদের কি কি হতে পারে এই অহেতুক চিন্তা একটি মারাত্মক ভয়। অথচ আমরা মনে প্রাণে জানি যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমরা কিছুই করতে পারব না। কালের নিয়মে যেটা ঘটার সেটা ঘটবেই শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই ভয় মানুষকে বিবশ করে আরো ঘোরতর কর্মচক্রে ফেলে গুণত্রয়ের জাঁতা-কলে পেষে। ভবিষ্যৎ ভাবনার ভয় থেকে নিস্তারের একমাত্র উপায় মনে নেতিবাচক চিন্তার স্থান না দেওয়া। যদি নেতিবাচক চিন্তা আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ চিন্তাটিকে ইতিবাচকে রূপান্তরিত করে দেওয়া। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বাড়িয়ে সত্যকে মেনে নেওয়া এবং সর্বোপরি গুরু ও ভগবানের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তিসহ শরণাপন্ন হওয়া।

২) লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে, অর্থাৎ লোকচক্ষুর ভয়। এটা আর একটা নেতিবাচক ভয়। মানুষ যদি অসৎ বা কুকর্ম না করে তাহলে এই ভয় থাকবে কেন? প্রত্যেক মানুষের ভাবনা অনুযায়ী দৃষ্টিকোণ পৃথক পৃথক। যিনি অহঙ্কারশূন্য শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা অর্থাৎ সুবুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন এবং শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে কর্তব্য কর্ম করে চলেন তিনি কখনো লোকচক্ষুর ভয় পান না। লোকে কি বলবে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপন বিবেক ও বুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিতে জীবাত্মার অবস্থান। অতএব আত্মার নির্দেশে চালিত হতে পারলে এই ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

একদা প্রত্যুষে এক মহাত্মা পরমানন্দে গাছ-তলায় শুয়েছিলেন। একটি চোর মহাত্মাকে গাছ তলায় শুয়ে থাকতে দেখে ভাবল এ আমারই ভাই, সারারাত্রি চুরি করে এখন গাছ তলায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একজন মদ্যপ ব্যক্তি গাছ তলায় মহাত্মাকে শায়িত দেখে ভাবল এ আমার বড় ভাই। গতরাত্রের নেশা এখনও কাটেনি। বেশ কিছুক্ষণ পর এক অবধূত সন্ন্যাসী মানুষটিকে দেখে বুঝলেন ইনি একজন উচ্চ কোটির মহাত্মা, পরম যোগানন্দে গাছ তলায় শায়িত আছেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টি অনুযায়ী ভাবনাও ভিন্ন ভিন্ন। আপনাকে আপনি দেখতে হবে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির দ্বারা নিজেকে জানতে হবে, দেখতে হবে। লোকের চোখে নিজেকে বিচার করলে আত্মোহঙ্কার অথবা আত্মগ্লানি আসার সম্ভাবনাই বেশী।

এক চিত্রকার লোকমুখে সনামধন্য ছিলেন। তিনি একবার ভাবলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি (Potrait) অঙ্কন করে তা

ভগবানকে দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবেন। সেইমত দ্বরকাধামে পৌঁছে নিজের পরিচয় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দু-মিনিটের জন্য স্থির হয়ে বসতে বললেন। ভালো করে ভগবানকে দেখে নিয়ে চিত্রকার বললেন, ''আমি দু-দিনের মধ্যে হুবহু আপনার একটা চিত্র অঙ্কন করে আনবো।'' দুদিন পর চিত্রকার চিত্রটি নিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছলেন এবং গর্বের সাথে বললেন, ''দেখুন আপনার কেমন চিত্র অঙ্কন করেছি। ভগবান তৎক্ষণাৎ যোগবলে নিজের রূপ পরিবর্তন করে বললেন, ''কই এতো আমার চিত্র নয়।'' তখন চিত্রকার একটু অবাক হয়ে বললেন, ''তাই তো! সেদিন বোধহয় আপনাকে আমার ঠিকমতো নিরীক্ষণ করা হয়নি। আপনি কৃপা করে আর একবার দু-মিনিটের জন্য বসুন আমি ভালো করে আপনাকে দেখেনিই।'' যথারীতি দুদিন পর চিত্রকার আর একটি চিত্র নিয়ে ভগবানের দরবারে হাজির। পুনরায়, ভগবান রূপ পরিবর্তন করার ফলে চিত্রটি ভগবানের অনুরূপ হল না। চিত্রকার ব্যাপারটা বুঝে মনোকষ্টে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে গৃহ অভিমুখে ফিরে চললেন। এমন সময় মহর্ষি নারদের সঙ্গে পথে দেখা। নারদ চিত্রকারকে দেখে হতাশার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন চিত্রকার ঘটনাটি বিস্তারিত বললেন এবং নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করলে ভগবানের সঠিক চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। তখন নারদ পরামর্শ দিলেন ভগবানের চিত্র অঙ্কন না করে একটা দর্পণ নিয়ে ভগবানের কাছে যেতে। যখনই ভগাবান চিত্র দেখতে চাইবেন তখনই তাঁর সামনে ঐ দর্পণটা ধরে দাঁড়াতে। সেইমতো পরদিবস চিত্রকার একটি দর্পণ নিয়ে ভগবানের দরবারে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিত্র দেখতে চাইলে তৎক্ষণাৎ চিত্রকার দর্পণটি তাঁর সম্মুখে ধরলেন এবং দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্র ভগবানকে দেখালেন। তখন ভগবান হেসে বললেন, ''দেখ চিত্রকার! নিখুঁত চিত্র অঙ্কনের অহঙ্কারে তুমি ভগবানের চিত্র অঙ্কন করতে পারছিলে না। যদি তোমার অন্তঃকরণ এই দর্পণের মতো স্বচ্ছ হোত তাহলে প্রথমবারেই তুমি ভগবানের সঠিক রূপ দেখতে পেতে।''

গীতার এই শ্লোকটিকে জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য ভগবান ও শ্রীগুরুর কাছে তিনটি প্রার্থনা নিত্য করণীয় — নির্হঙ্কার, নির্বাসনা ও নির্ভয় - 'অভয়ম্'।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীতাপস বন্দোপাধ্যায়

ভাগবৎ-কথা

ভগবান বিষ্ণু ও মহর্ষি মৌদ্‌গল্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মহাঋষি মুদ্‌গলের পুত্র 'মৌদ্‌গল্য' অতি সদাচার পরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতীরেই যথাবিধিপূর্বক ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। বিষ্ণু মৌদ্‌গল্যের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহার পূজা গ্রহণান্তে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম আলাপ-আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যা হইলে মৌদ্‌গল্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পত্নী জাবালার নিকট বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা সব বর্ণনা করিতেন। একদিন জাবালা মৌদ্‌গল্যকে বলিলেন —''যে বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই মানবের সর্ব দুঃখ দূর হয়, সেই বিষ্ণুর সহিত তোমার প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইতেছে অথচ তোমার দারিদ্র্য দূর হইতেছে না কেন?'' পত্নীর এই কথা শুনিয়া তখন মৌদ্‌গল্য পরদিবসে বিষ্ণুর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন —''প্রাণীগণ স্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে। অন্য কেহই তাহার হিতাহিত করিতে পারে না। সকল কর্মের মধ্যে দানই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে স্মরণপূর্বক যাচককে যাহা দান করিবে, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।'' মৌদ্‌গল্য বলিলেন —''আমার দেয় বস্তু কিছুই নাই, এমনকি আমার দেহ-মন সমস্তই আপনাতে সমর্পিত।'' মৌদ্‌গল্যের কথা শুনিয়া বিষ্ণু গরুড়কে কিছু খুদ আনিতে বলিলেন। গরুড় তাহা আনিলে তখন মৌদ্‌গল্য সেই খুদকণাগুলি বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি বিষ্ণুর প্রসাদে মৌদ্‌গল্যের সর্বপ্রকার দারিদ্র্যতা দূর হইল।

মহর্ষি মৌদ্‌গল্যকে নৃপতি শতদ্যুম্ন নানারূপ দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হিরণ্ময় অট্টালিকা দান করেন। সেই পুণ্যফলে শতদ্যুম্ন রাজার স্বর্গলাভ হয়।

মৌদ্‌গল্য ঋষি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বেও উপস্থিত ছিলেন।

(সহায়ক গ্রন্থ : ব্রহ্ম-পুরাণ ও মহাভারত)

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৬)

দেবতা ইন্দ্র —

ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন ইন্দ্র। যদিও পরবর্তী সাহিত্যে তিনি তাঁর প্রাধান্য হারিয়ে দশ-দিকপালের অন্যতম দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রে তাঁর উদ্দেশ্যে নিয়োযিত সূক্তের সংখ্যা সর্বাধিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকডোনেল লিখেছেন — "Indra is the favourite National God of the Vedic Indians. His importance is indicated by the fact that about 250 hymns celebrate his greatness, more than those devoted to any other God and very nearly one-fourth of the total number of hymns in the Rig Veda. If the hymns in parts of which he is praised or in which he is associated with other Gods, are taken into account, the aggregate is brought up to at least 300." (Vedic Mythology Pg.54)

অদ্ভুতকর্মা এই দেবতার কথা কেবল বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগেই কথিত হয় নি পুরাণ এবং অপরাপর সাহিত্যের অনেক স্থানেই তাঁর কথা বলা হয়েছে। আমরা ক্রমশঃ সেই সব বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রবেশ করব। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের একটি সূক্তে (২/১২/১) পাই জন্মমাত্রই কর্মের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন —

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্র।।

অর্থাৎ — হে মানুষেরা, যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মমাত্রেই দেবতাদের প্রধান ও মনুষ্যদের অগ্রগণ্য হয়ে বীরকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের ভূষিত করেছিলেন, তাঁর শরীরের বলে দ্যাবা পৃথিবী ভীত হয়েছিলেন, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র।

ভারতীয় পণ্ডিতেরা 'ইদি পরমৈশ্বর্যে' ধাতু থেকে ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন। তাঁদের মতে, যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বা সকলের অধিপতি তিনিই হলেন ইন্দ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। কারো কারো মতে ইন্দু শব্দ থেকে এর ব্যুৎপত্তি হতে পারে। ম্যাকডোনেল বলেন - "The etmology of Indra is doubdful, but the root is connected with that in indu drop, seems likely."

বিশ্বের যা কিছু বল বা শক্তিসাধ্য কর্ম সেটাই ইন্দ্রের কর্ম বলে নিরুক্তকার মনে করেছেন -''যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈর তৎ'' (নিঃ ৭/৪০)। প্রকৃতিবাদীদের মতে ইন্দ্র মধ্যমস্থানের দেবতা ''বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ'' (নিঃ ৭/৫/২) বৈদিক শব্দকোষ নিঘন্টুকেও (৫/৪) মধ্যমস্থানের দেবতালিকায় তাঁর নাম পড়া হয়েছে। মধ্যমস্থান থেকে বৃষ্টি পড়ে মেঘ গর্জন করে বলে রসের দান হল ইন্দ্রের প্রধান কর্ম। বৃত্রকে বধ করে তার দ্বারা ধরে রাখা জলকে তিনি পৃথিবীর দিকে প্রধাবিত করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁর প্রধান আয়ুধ বজ্রের দ্বারা মেঘ বিদীর্ণ করে বৃষ্টি আনয়ন করেছিলেন। এই প্রকৃতিলোকের ঘটনার রূপককে কেন্দ্র করে বৃত্রবধের উপাখ্যান গড়ে উঠেছিল। শৌনক রচিত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এসব ঘটনার পর্য্যালোচনা করে লেখা হয়েছে —

রসদানং তু কর্মাস্য বৃত্রস্য চ নিবর্হণম্।
স্তুতেঃ প্রভুত্বং সর্বস্য বলস্য নিখিলাকৃতিঃ।।

ঋগ্বেদের কোন একটি সূক্ত থেকে ইন্দ্রের সমগ্র কার্যের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন সূক্তের বিবরণ একত্র করলে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমরা পেতে পারি। কুরুসুতি ঋষি বলেছেন - ইন্দ্র জন্মেই বহুকর্ম-বিশিষ্ট হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উগ্র কে? এবং প্রসিদ্ধ কে? মাতা শবসী তৎক্ষণাৎ তা বলে দিলে সেই বৃত্র হত্যাকারী ইন্দ্র তাদের রজ্জুদ্বারা রথচক্রের অরসমূহের মত যুগপৎ আকর্ষণ করলেন এবং দস্যুগণকে হনন করে প্রবৃদ্ধ হলেন (ঋক্ সং ৮/৭৭/১-৩)।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' **-এর বঙ্গানুবাদ)**

(৪)

মনুষ্য জন্মের মূল্যবোধ —

মনুষ্য জন্মের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। যেহেতু শিশুর জন্ম দেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ এবং

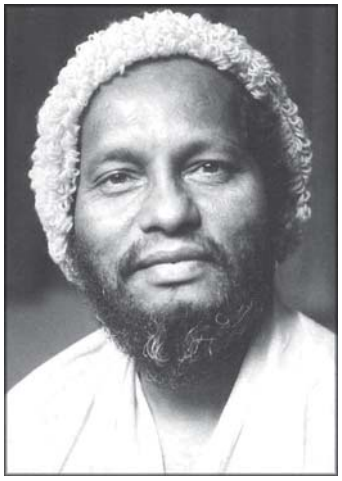

স্বামী মুক্তানন্দ

মনুষ্যদেহ লাভ করে আমরা বেশীরভাগ লোকেরাই ইন্দ্রিয় উপভোগে জীবন অতিবাহিত করি, সেইজন্য আমরা মনুষ্য জীবনকে খুবই সস্তা ভাবি। কিন্তু মনুষ্য দেহ অমূল্য। সাধকরা বলেন মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। সহস্র যোনি পার হয়ে তবে মুনষ্যদেহ লাভ করা যায়।

একবার গুরুনানকের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, ''মনুষ্য জীবনের মূল্য কি?'' সাধু বললেন, ''কাল এস, আমি বলব।'' পরদিন সকালে যখন শিষ্যটি আসল, গুরুনানক শিষ্যটির হাতে একটা হীরে দিয়ে বললেন, ''এইটা বাজারে নিয়ে গিয়ে এর মূল্য যাচাই করে এস, এটা বিক্রী কোরো না। শুধু প্রত্যেক দোকানে গিয়ে এর মূল্য জেনে এস। '' শিষ্যটি হীরাটি বিভিন্ন দোকানে নিয়ে গেল। প্রথমে সে ফলের দোকানে গেল ও জিজ্ঞাসা করল, ''এই হীরাটির বদলে আমাকে কত দেবে?'' ''আমি তোমাকে দুটো কমলালেবু দেব''— ফল বিক্রেতা বলল। এরপর সে আলুর দোকানে গেল, দোকানদার বলল, ''আমি তোমাকে চার কিলো আলু দেব।'' তারপর শিষ্যটি একটা সাধারণ স্বর্ণকারের দোকানে গেল সে একশো টাকা দিতে চাইল। শিষ্যটি বিভিন্ন স্বর্ণকারের দোকানে গেল এবং প্রত্যেকেই কিছু বেশী টাকা দেবার প্রস্তাব করল। শেষে সে শ্রেষ্ঠ স্বর্ণকারের দোকানে গেল। সে স্বর্ণকারের হাতে হীরাটি দিল, স্বর্ণকারটি বলল, ''ভাই, তুমি এটি বিক্রী কোরো না। এটি অমূল্য।'' শিষ্যটি হীরাটি নিয়ে নানকদেবের কাছে ফিরল এবং যা যা ঘটেছিল সেইসব বলল। ''এইবার তুমি মানুষের মূল্য বুঝতে পারবে'' নানকদেব বললেন, ''একজন মানুষ দুটি কমলালেবু বা চার কিলো আলুর বদলে নিজেকে বিক্রী করতে পারে আবার যদি সে চায় সে নিজেকে অমূল্য ধনে পরিণত করতে পারে। এই সমস্তই তার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করছে।'' প্রসিদ্ধ সাধক সুন্দরদাস লিখেছেন, ''ঈশ্বরের কৃপায় তুমি এই মনুষ্যদেহ লাভ করেছ। তুমি যে বারবারই এটা পাবে তা নয়। হে বিস্মৃত পুরুষ মনে রেখ! এই মনুষ্যদেহ অমূল্য বস্তু, একে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিও না।''

যখন তুমি তোমার নিজের অন্তরাত্মাকে দেখতে পাবে তখন দেহের মূল্য বুঝতে পারবে। মনুষ্য দেহ হচ্ছে একটা মন্দির যার ভিতর আত্মা রূপে ঈশ্বর বাস করেন। যাহা হউক, এটা জানতে তোমাকে যেতে হবে ধ্যানের মধ্যে। বর্তমান অবস্থায় তোমার কেবল আংশিক সচেতনতা আছে। তুমি পৃথিবীকে জাগ্রত অবস্থায় কেবল জানো। এর বাইরে কি আছে তা তুমি জান না। যদিও তুমি প্রত্যেক রাত্রিতে সাধারণ জগতের বাইরেও অন্য এক জগতের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কর। যখন তুমি জাগ্রত, যা কিছু তোমার চারপাশে দেখছ তা সবই তোমার কাছে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু যখন তুমি নিদ্রা যাও এবং স্বপ্ন দেখ তখন জাগ্রত অবস্থার জগৎ লোপ পায় এবং স্বপ্নের জগতকে সত্য বলে মনে হয়।

প্রাচীন ভারতে জনক নামে এক সম্রাট ছিলেন তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি পুষ্পকোমল শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর ভৃত্য তাঁকে হাওয়া করছে, প্রহরীরা আজ্ঞার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। নিদ্রিত অবস্থায় জনক স্বপ্ন দেখলেন যে প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছেন ও তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। বিজয়ী রাজা তাঁকে মুক্তি দিলেন কিন্তু রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বললেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জনক রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন, এবং অনশনে দিন কাটাতে লাগলেন। এইরূপ অবস্থায় যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একদিন একটি শয্য ক্ষেতে আসলেন ও কিছু শয্য তুলে খেতে আরম্ভ করলেন। ঠিক তখনই শয্য

ক্ষেতের মালিক সেখানে উপস্থিত হয় এবং একজন অজ্ঞাত লোককে তার শষ্য খেতে দেখে বেত দিয়ে ভীষণ ভাবে প্রহার করতে লাগে। বেতের আঘাতেই জনকের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং নিজেকে তাঁর নিজের বিছানার মধ্যেই দেখলেন। ভৃত্যরা হাওয়া করছে, প্রহরীরা তাঁর আজ্ঞার নিমিত্ত দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি নিশ্চিন্তে আবার নিদ্রামগ্ন হলেন।

আবার তিনি সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে তিনি শষ্যক্ষেতে উপস্থিত হয়ে শষ্য খাচ্ছেন আর মালিক দ্বারা প্রহৃত হচ্ছেন। তিনি আবার চোখ খুলে নিজের রাজশয্যায় নিজেকে দেখলেন। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আরে! কোনটা সত্য, আমার স্বপ্ন না আমি এখন যেটা দেখছি?' আমাকে এর উত্তর পেতেই হবে।

রাজা সমস্ত দেশে দূত পাঠালেন এবং সমস্ত রাজ্যে সর্বত্র ঘোষণা করলেন ও দেশে যত পণ্ডিত, সাধু, দার্শনিক, মনোচিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারকর্তা আছেন, তাঁদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালেন তাঁর কাছে আসতে এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে। তাঁরা সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তিনি তাঁর স্বপ্নের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন — ''বলুন কোনটা সত্য, আমার জাগ্রত অবস্থা না স্বপ্নাবস্থা?'' কিন্তু কেউই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। কারণ তাঁরা যদি স্বপ্নাবস্থাকে সত্য বলেন তাহলে তাঁদের জাগ্রত অবস্থাকে অসত্য বলতে হয়, আবার তাঁরা যদি জাগ্রত অবস্থাকে সত্য বলেন তবে স্বপ্নকে অসত্য বলতে হয়। রাজা প্রচণ্ড বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ''এত বছর ধরে তোমাদের আমি পালন করছি তোমরা আমার একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছ না!'' তিনি তাদের রাজকারাগারে বন্দী করে রাখতে বললেন। তিনি তাঁর প্রশ্ন সমস্ত রাজ্যে প্রকাশ্য স্থানে আঁটকিয়ে রাখলেন — 'জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যে কোন অবস্থা সত্য? এই প্রশ্নের যে উত্তর জানে আমার কাছে এসে তার ব্যাখ্যা শোনাবে।' অনেক দিন কেটে গেছে অষ্টাবক্র নামে এক মুনির ছেলে ছিল তার শরীর আট জায়গায় আঁকাবাঁকা থাকার জন্য তার নাম অষ্টাবক্র হয়। একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে ''আমার পিতা কোথায়?'' তার মা জবাব দেন তিনি রাজকারাগারে বন্দী। অষ্টাবক্র প্রশ্ন করেন, ''তিনি কি কোনো দ্রব্য চুরি করেছিলেন?'' ''না। তিনি রাজার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারায় রাজা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন''- মা উত্তর দিলেন। অষ্টাবক্র বললেন ''আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি''। তিনি সোজা রাজার কাছে গেলেন। রাজপ্রাসাদের বাহিরে একটা বৃহৎ বাদ্য যার পাশে লেখা আছে, 'যদি কেউ রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাও বাদ্য বাজাও'। অষ্টাবক্র বাদ্যে আঘাত করাতে রাজপ্রাসাদের দ্বার খুলে গেল এবং তাঁকে রাজার অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। রাজপরিষদরা যখন অষ্টাবক্রকে আসতে দেখল তারা হাসতে আরম্ভ করলেন, তারা কৌতুক বোধ করলেন এই ভেবে যে, যখন রাজ্যের জ্ঞানী পণ্ডিতরা পর্যন্ত রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না তখন এই কিম্ভুতপ্রায় বিকৃত বামনটি রাজার প্রশ্নের উত্তর দেবে? তাদের দেখে অষ্টাবক্রও হাসতে লাগল। রাজা প্রশ্ন করলেন, ''রাজ পরিষদরা হাসছেন কারণ তুমি অদ্ভুত ভাবে হাঁটছ এবং তুমি খুবই অল্পবয়সী, কিন্তু তুমি কেন হাসছ?'' অষ্টাবক্র উত্তর দিল, ''হে মহারাজ, আমি শুনেছিলাম আপনি এবং আপনার পরিষদরা জ্ঞানী, কিন্তু এখন দেখছি আপনারা কত বোকা। আপনারা আমার বিকৃত চেহারা দেখে হাসছিলেন, কিন্তু সেটা কেবল শরীরের বাহ্যিক ব্যাপার। সমস্ত শরীরই পঞ্চভূতের সৃষ্টি। যদি আপনি আত্মার দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমার দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন যে সবার মাঝে একই আত্মা বিরাজমান এবং এতে হাসার কিছু নেই। আর আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে — হে রাজন, জাগ্রত বা স্বপ্ন কোনও অবস্থাটিই সত্য নয়। যখন আপনি জাগ্রত, স্বপ্নের রাজ্য নেই, এবং যখন আপনি স্বপ্নের মধ্যে আছেন, জাগ্রত জগৎ থাকে না। সেইজন্য কোনোটাই সত্য নয়।'' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ''যদি জাগ্রত এবং স্বপ্ন দুটোই অসত্য হয়, তাহলে সত্যি কি?'' ''সেটা এই দুই অবস্থার অতীত, অন্য এক অবস্থা''-অষ্টাবক্র জবাব দিল, ''সেই অবস্থাকেই খুঁজে দেখুন। এই অবস্থাটিই কেবল সত্য।''

..ক্রমশঃ

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি ঃ— অনিবার্য কারণবশতঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা' ক্রমিক প্রসঙ্গটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। পরবর্তী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

কৌল অবধূত শ্রীশ্রীনবম তারাপুরী

সাঁতরাগাছি স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটা সবে বের হচ্ছে, এমন সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ট্রেনে উঠলেন জয়ন্তদা। উঠেই আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন, ''ভাবলাম ট্রেনটা বোধহয় পাব না''- বলে বসে পড়লেন উল্টোদিকের সীটে। সঞ্জয়দা রামরাজাতলা থেকে ট্রেনে উঠে চুপচাপ বসেছিলেন। আমি ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করছিলাম। তিনজন খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর জয়ন্তদা জিজ্ঞাসা করলেন, ''সৎপ্রসঙ্গের কি আলোচনা হবে না আজ!'' আমি বললাম, ''যতটুকু জানি আর বলার অনুমতি আছে ততটা নিশ্চয় করে বলে দেবো। বলুন কি জানতে চান?'' এবার সঞ্জয়দা নড়েচড়ে বসলেন মুখে হাসিও ফুটল তাঁর। ''আগের দিন বলছিলে না, তোমার গুরুমহারাজের অনেকজন গুরু, তা উনি কি তন্ত্র সাধনাও করেছিলেন?'' প্রশ্ন করলেন জয়ন্তদা। সঞ্জয়দার মুখের ভাবখানার আর একটু পরিবর্তন হোল। বুঝলাম তন্ত্রের প্রতি ওনার হয়তো অশ্রদ্ধা থাকতে পারে। বললাম ''বেশ, তবে আজ একটু তন্ত্র প্রসঙ্গই হোক!''

শুরু করলাম, ''শুনেছি গুরুমহারাজের চারজন মূল তন্ত্রগুরু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওনার কৌল আচার্য ছিলেন নবম তারাপুরীজী। গুরুমহারাজের কাছ থেকে শোনা প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার থেকে শুরু করছি। কোনো এক বিশেষ প্রশ্নের সমাধানের জন্যে গুরুমহারাজ, গিয়ে পৌঁছেছিলেন গুরুজী শ্রী নবম তারাপুরীর কাছে। ওনার বাড়ির চৌকাঠে পা রাখতেই গুরুজী বলে উঠলেন, ''ওই এসে গেছে''। ওনাকে মণ্ডলাকারে শিষ্য-শিষ্যারা ঘিরে বসেছিলেন, সকলে জিজ্ঞাসা করলেন —''কে বাবা, কে বাবা!'' উনি বললেন,''বগলা পুজোর সময় তোরা এগারোজন সঙ্কল্প করেছিলি, আমি বলে ছিলাম বারোজন হবে ওই সেই লোক।'' গুরুমহারাজকে দেখেই উনি বললেন, ''তোর তো এক বছর আগে আসার কথা ছিল।'' গুরুজীর ভৈরবী বুড়িমা বলেন আমাদের গুরুমহারাজ-এর (স্বামী নিগমাত্মানন্দজী) সৎগুরু মহেশ মহারাজ (যিনি সারদা মা-এর মন্ত্র শিষ্য এবং রাজগীর রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) দেহত্যাগের পরই নবম তারাপুরীজীকে দর্শন দিয়ে বলেন,''আমার শিষ্য আসছে তাকে তোমাকে সম্যকভাবে তন্ত্র-সাধন শেখাতে হবে।'' গুরুমহারাজ-এর জীবনে তন্ত্রের কৌল সাধনের পর্যায় শুরু হয় এই ঘটনার হাত ধরেই। গুরুমহারাজ বলতেন, ''জানিস আমার আর গুরুজীর মধ্যে মোবাইল ফোনে কথা হোত। গুরুজীর বাড়ীর ছাদে যে হোমকুণ্ড আছে ওখানে গুরুজী নিজের আসনে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে পঞ্চমুণ্ডীতে চলে যেতেন আর ওখান থেকে নির্দেশ দিতেন। আর আমি বলতাম মোবাইল .....তখন মোবাইল ফোন কোথায়! আর গুরুমহারাজ হা হা করে হাসতেন।'' পরে যেদিন গুরুজীর বাড়ী গেলাম দেখলাম সত্যিই ওনার বাড়ীর ছাদে যজ্ঞকুণ্ড আর পঞ্চমুণ্ডীর আসন ওনার বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে একটা বাড়ীতে যেখান থেকে ফোন ছাড়া কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। এখন বুঝেছি ওনাদের ফোনটা একটু অন্য রকমের ছিল। আরো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল ওনার বাড়ীর হোমকুণ্ডটা খোলা আকাশের নীচে, যেখানে বারো মাস হোম হোত। গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বর্ষায় কি করে হোম হোত? গুরুমহারাজ বলেছিলেন উনি ত্রিশূল দিয়ে বৃষ্টি স্তম্ভন করতেন তাই ওনার বাড়ীর ছাদ বাদ দিয়ে সব জায়গায় বৃষ্টি হোত। মনে পড়ে গেল সাধক বামাক্ষ্যাপা সিনেমায় এরকমই একটা কাণ্ড দেখেছিলাম।''

জয়ন্তদা আর সঞ্জয়দা কারোরই চোখের পাতা পড়ছে না। বললাম, ''বাউরিয়া এসে গেছে এবার ট্রেন থেকে নামতে হবে যে!'' ওনারা বললেন, ''আমরা আরো শুনতে চাই।'' বললাম, ''ঠিক আছে ফেরার সময় বাকিটা হবে।''

বিকেলে কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস আর হাঁটা পথ অতিক্রম করে আমরা বজ্‌বজ্‌ ফেরীঘাট থেকে লঞ্চে উঠলাম তারপর অটোযোগে বাউরিয়া স্টেশনে পৌঁছেই সঞ্জয়দা আর জয়ন্তদা চা-এর দোকান থেকে আমাকে কেক, বিস্কুট, চা ইত্যাদি খাওয়ালেন। মজা হচ্ছিল, কলেজ জীবনে হাত দেখার নাম করে (যেটা আমি একটুও পারি না) কত বন্ধুদের কাছ থেকে কত কিছু খেয়েছি এসব ভাবছি— ''এবার তাহলে শুরু হোক!'' আমার চিন্তাস্রোতে ছেদ করে জয়ন্তদা বললেন। ট্রেন তখনো আসেনি তাই স্টেশনে বসেই শুরু করলাম। ''গুরুজীর জন্ম হয়েছিল বর্ধমান জেলার বনকাবাঁশি মুরুলিয়া গ্রামে। ছোট্ট থেকেই ওনার ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। বিশেষ কারণে ওনাদের গ্রাম ছেড়ে কলকাতা চলে আসতে হয়। ওনার পিতা সত্যবাবু ছিলেন জ্যোতিষ, সংস্কৃত

এবং গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত। রোগশয্যায় শুয়ে যখন সত্যবাবু ছোট্ট তপনের উপবীত ধারণের ব্যবস্থা করেন তখন চন্দ্রতপন বন্দোপাধ্যায় তথা নবম তারাপুরী নয় বছরের বালক। উপবীত বিধি অনুসারে ব্রহ্মচারীর একজন ভিক্ষা মা হন। কিন্তু দুরবস্থাসম্পন্ন পরিবারের পাশে তখন কেউই ছিল না। তাই কেউই ভিক্ষে মা হলেন না। তপনের মা, গঙ্গা দেবী স্বামীকে জানান তপন জানতে চাইছে ওর ভিক্ষা মা কে হবে? সত্যবাবু জানান, ''ছেলেকে বল কালীঘাটের মা কালীই ওর ভিক্ষা মা।'' তপন খুব খুশি কিন্তু তিনদিন পর দণ্ডীঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, ''আমার ভিক্ষে মা তো আমায় কিছু দিল না।'' কি আর উত্তর দেবেন গঙ্গাদেবী কিন্তু রাতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কালীঘাটের মা কালী রাতে তপনকে দেখা দিয়ে বলেন, ''তোর ভিক্ষার সব জিনিস ওমুক খানে রাখা আছে।'' পরদিন সকালে ছোট্ট তপন পরণের প্যান্ট ধরে, দৌড়ায় নির্দিষ্ট স্থানে। মাটি খুঁড়ে পায় ভিক্ষার থলি তাতে চাল, টাকা আর ওর আঙুলের মাপের একটা মীনে করা আঙটি ছিল; আর আশ্চর্যের বিষয় ওই আঙটিটা গুরুজীর দেহরাখার আগের দু-একদিন পর্যন্ত তাঁর হাতে ছিল। আশ্চর্য হল যে আঙটির মাপ নিজে নিজেই পরিবর্তিত হয়েছিল। নয় বছরের একটা বালক আর পরিণত বয়সে ছয় ফুটের ওপর লম্বা দৈত্যকায় চেহারার হাতের আঙুলের মাপের তো বিস্তর পার্থক্য তাই না!

এগারো বছর বয়সে কূলগুরু শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তপনকে দীক্ষা দেন। ওই এগারো বছর বয়সেই কোন এক দাদার হাত ধরে পৌঁছে যান ঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসের কাছে। ঠাকুর মহারাজ তপনকে দেখে খুব খুশি হন; গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ''এর হবে, এ তন্ত্র সম্রাট হবে।'' যাই হোক এগারো বছর বয়স থেকেই চন্দ্রতপন সাধনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তারকেশ্বরের তৎকালীন মহান্ত শ্রী যতীশ গিরি, ব্রহ্মানন্দ আগমবাগীশ, আচার্য কেশবভারতী এবং বামাক্ষ্যাপা বাবার শিষ্য তারা ক্ষ্যাপাজী ছিলেন গুরুজীর তন্ত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের গুরু। শ্রীনবম তারাপুরী তন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সাধন করতে করতে কাপালিক হয়ে পড়েন। তাঁর গলায় থাকত শঙ্খমালা আর রুদ্রাক্ষ, এক হাতে মড়ার খুলি আরেক হাতে ত্রিশূল । এই ভাবে ভৈরব রূপে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্মশানে উনি শ্মশান-সাধনা শেষ করেন।''

স্টেশনে ঘোষণা হল ডাউন-পাঁশকুড়া-লোকাল আসছে। কিন্তু ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়েই আছেন বললাম, ''বাকিটা ট্রেনে উঠে বলি?'' ট্রেনে উঠে সীটে বসলাম আমরা। একজন হকারের কাছ থেকে দিলখুশ কিনে প্যাকেটটা কেটে হাতে দিয়ে সঞ্জয়দা প্রশ্ন করলেন, ''তারপর কি হল?'' বললাম, ''নবম তারাপুরীজী শুধু সাধনাই করেন নি উনি সংসারী ছিলেন, চাকরী করতেন, রেডিওতে গান করতেন, বিরাট বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ওগুলো পরে বলব। আগে কামখ্যার ঘটনাটা বলি। একবার চাকরী সূত্রে আসাম যেতে হয় তাঁকে, সেবার আসামে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। চারিদিকে বানভাসি অবস্থা। রেহাই পেলেন না গুরুজীও। বোটে করে তিনদিন ধরে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একটা গাছের কাছে পৌঁছলেন উনি। গছটাকে পেয়ে ওতেই উঠে পড়লেন গুরুজী। তিনদিন ধরে কিছু খান নি শুধু অনবরত জপ করে চলেছেন। হঠাৎ দূরে দেখতে পেলেন একটা সাঁওতালী মেয়ে সাঁতরে আসছে। মাথায় তার হাঁড়ি। মেয়েটা গাছের কাছে এসে গাছে উঠে বলে, ''আহা! খাওয়া হয়নি মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'' বলে হাঁড়ি খুলে ভাত খাইয়ে দেয় গুরুজীকে। গুরুজী অভিভূত হয়ে পড়েন। ভগবানের মহিমা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। মুখ দিয়ে কথা ফোটেনা তাঁর মনে শুধু ইষ্টমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। জপ চলে অনবরত। তারপর মেয়েটা আবার সাঁতরে চলে যায়। এরপর থেকেই জল কমতে শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে চারিপাশ চলার উপযুক্ত হলে গুরুজী গাছ থেকে নেমে আসেন। এরও পর নাকি সহমর্কীদের সাথে দেখা হয়। এবার ফেরার পালা কিন্তু হঠাৎ দৈববাণী হয়— ''ঘরে ফেরা যাবে না সঙ্গে এস''। আবার দেখতে পান সাঁওতালী মেয়েটিকে, হাতে তার সাপ লিক্‌লিক্ করছে। নবম তারাপুরী মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যান। কামাখ্যা পাহাড়ে এসে থামে মেয়েটি। তারপর পাহাড়ে উঠে একটা ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার দৈববাণী হয় যে ওখানে বসেই সাধনা করতে হবে। পনের দিন ওই স্থানে বসে ধ্যানের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন গুরুজী। অবশেষে পনেরতম দিনে দেবী দর্শন দিলেন; নবম তারাপুরী হলেন সিদ্ধ মনোরথ। এরপর কলকাতায় ফিরলেন তিনি। চাকুরীতেও পদোন্নতী হল তাঁর। ১৯৭২ সালে নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ আবার মহালয়ার আসনে এসে দর্শন দিয়ে বলেন যে উনি বর্তমানে গায়ত্রীলোক অথবা গুরুলোকে অবস্থান করছেন। আর গুরুজী তখন নৃসিংহমণ্ডলে অবস্থান

করছিলেন। হয়তো গুরুজীকে তিনি গায়ত্রী লোকেই যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু গুরুজী জানান উনি সূর্যমণ্ডলে যাবেন সেই সাধনাই করছেন। জানেন ওনার দেহত্যাগের পর আরো আঠারো বছর ওনাকে সাধন করতে হয়েছিল। ২০০০ সালে মহালয়ার আসনে এসে গুরুজী শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন ''আমি সূর্যমণ্ডলে পৌঁছে গেছি।'' যোগ সাধনার অনেক উচ্চস্তরে ছিলেন তিনি। ''যোগ সাধনা আবার কবে করলেন?'' প্রশ্ন করলেন সঞ্জয়দা। হেসে বললাম ''যোগ-সাধনা ছাড়া তন্ত্র-সাধনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না একথা গুরু মহারাজ বলেছেন গো। গুরুজী তন্ত্র সাধনার একটি পর্যায়ে পৌঁছে দেখলেন এবার যোগ আর নির্গুণ ব্রহ্মের সাধন করতে হবে। দীক্ষা মানে মন্ত্রদীক্ষা, শাক্তাভিষেক, পুরশ্চরন, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্য দীক্ষার পর মহা-সম্রাজ্য দীক্ষার স্তরে গিয়ে যোগ-সাধনা করতেই হবে না হলে পরবর্তী পর্যায় মানে পূর্বদীক্ষা আর পাবে না। এই ক্রমটি ঠাকুর নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজও মেনে চলেছিলেন শুধু একটা স্তরে কিছু পরিবর্তন করেছিলেন নবম তারাপুরীজী। যাই হোক সেই সময় নবম তারাপুরী যোগী-গুরু অনুসন্ধান করতে থাকেন। আর দৈবকৃপায় জানতে পারেন বলরামবাটীর শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দতীর্থ তাঁর যোগীগুরু। এই পূর্ণানন্দজী হলেন শ্রীযুক্তেশ্বরগিরি মহারাজের শিষ্যের (মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের) শিষ্য। নবম তারাপুরী তাঁর কাছ থেকেই ক্রিয়াযোগের পাঠও নেন। মজার কথা তখন আমার গুরু মহারাজও পূর্ণানন্দজীর কাছ থেকে ক্রিয়াযোগের শিক্ষা নিচ্ছিলেন। কিন্তু দুজনেই দুজনকে চিনতেন না তখন। পরবর্তীকালে তন্ত্রসাধনের সময় এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। যাই হোক যোগ-মার্গে নবম তারাপুরীজী অনেক উচ্চ স্তরে উঠেছিলেন। তাঁর অনেক অনুভূতির কথা উনি বুড়িমাকে বলে গেছেন, সেখান থেকেই বলছি। গুরুজী নক্ষত্র মণ্ডল, মাতৃকা মণ্ডল, কিন্নর মণ্ডল, ক্ষীর সমুদ্র, নরসিংহ মণ্ডলাদি অতিক্রম করে মহাসূর্যের পথে অগ্রসর হন এবং সৌরীমণ্ডলের উদ্দেশ্যে সাধন করতে থাকেন। কিন্তু মহাশূন্যের পথেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওনার দেহত্যাগ হয়ে যায়। ওনার স্থূল দেহত্যাগের পর ওনাকে আরো ১৮ বছর সাধনা করতে হয় সৌরীমণ্ডলে পৌঁছানোর জন্যে একথা আগেই বলেছি। যাই হোক আরো একটা কারণ ছিল ওনার দেহত্যাগের যে কথা গুরুমহারাজ আমাকে বলেছিলেন সেকথা বলার আগে বলি গুরুজীর তন্ত্রের আসনে আদিশঙ্কর, পদ্মপাদ, বামদেব, ঠাকুর মহারাজ তথা বহু মহাত্মা এবং তাঁর গুরুবর্গ সূক্ষ্ম দেহে আসতেন আর বিভিন্ন কর্মের নির্দেশ দিতেন। গুরুজী বিশ্ব কল্যাণমূলক কার্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর মূল তিনটি সঙ্কল্প ছিল, প্রথম যে তারা মন্ত্র থেকে কর্কট, কুষ্ঠ আর শ্বেতকুষ্ঠ রোগের প্রতিকার। যার অনেকটা তিনি করে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় পণপ্রথার ব্যবস্থার পরিবর্তন যাতে মেয়েদের আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে না হয় আর তৃতীয় সমাজ থেকে বেকারত্বের অবসান।

এই সময় নবম তারাপুরী বৈষ্ণব সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন। গলায় রুদ্রাক্ষের সাথে শোভা পেল তুলসী মালা। বৈষ্ণব ধারায় উনি দাস্যভাবে উপাসনা শুরু করেন। নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় দিবারাত্র নাম করতে থাকেন। এমন অবস্থা হয় 'যে সন্ধ্যা এসে ফিরে চলে যায়'। একই সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর সমাজসেবা মূলক কার্য। কিংকরবাটী গ্রামে গুরুমহারাজের তৈরী পঞ্চমুণ্ডীর আসনে গিয়ে পূর্ণাহুতি দানের পর নবম তারাপুরীজী পেয়ে যান তাঁর পরম্পরার পরবর্তী আচার্যকে। গুরুমহারাজকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ''তুই ওপরে উঠবি জানতাম কিন্তু এত উপরে উঠবি ভাবতেও পারিনি।'' আসলে তন্ত্র সাধনের পথে, চণ্ডী সাধনে পূর্ণ-সিদ্ধিলাভ খুব কম তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষেরই আছে। যাই হোক নবম তারাপুরীজী ঘোষণা করেন - ''তারক আচার্য হবে।'' এরই পর মহামায়া গুরুজীকে জানিয়ে দেন গুরুজীকে বিরজা নিতে হবে কারণ তাঁর আর কোন পূর্বকর্ম বাকি নেই। কিন্তু গুরুজী গৃহী আর বাকি কর্ম শেষ হলেও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কার্য যে শেষ হয় নি তাই তিনি রাজী হন না। যে সংসারে মহামায়া তাঁকে বসিয়েছেন সেই সংসারের কর্তব্য যে বাকি। তাই সংসারে থেকেই উনি বিশ্ব কল্যাণ মূলক কার্য করতে থাকেন। ১৯৭৮-এর বন্যায় শিষ্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুঃস্থ মানুষের পাশে। কিন্তু আদ্যাশক্তি মাহামায়ার কথা তো বিফলে যাবার নয়। যোগপথে সাধনের সময় মহাশূন্যের পথে সৌরীমণ্ডলের উদ্দেশ্যে যেতে গিয়ে ওনার স্ট্রোক হয় বিরাট ঠাণ্ডায়। গুরুমহারাজ বলেন, ''যদি উনি বিরজা নিয়ে নিতেন তবে হায় আর এমন অঘটন কি আর ঘটতো!'' সব জেনেও গৃহীর কর্তব্যের পালনের শিক্ষা দিতে দিতে উনি মহাকালকে বরণ করে নেন। অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৪ই নভেম্বর শনিবার দিন বারোটার সময় তারা-ধ্যানে বিভোর হয়ে মহাসাধক মাহসমাধি নেন।''

সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে থামলো ট্রেনটা। আমার দুই

সহকর্মীর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ওরা অভিভূত। শেষে বললাম, ''এখনকার ভূয়ো তান্ত্রিক নয় সত্যিকারের তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন আমার পরমারাধ্য পরমগুরু কৌলঅবধূত শ্রীশ্রী নবম তারাপুরীজী।''

—শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ চরণাশ্রিত
শ্রীঅরিন্দম মিত্র

গীতা ভাবনা

(৩৮)

গীতা ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব :—

(...পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গান্ধীজীর অহিংসা নীতির পথ বেয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন জওহরলাল। তিনি গীতার জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিপূর্ণ বলে মনে করতেন। ভারতীয় দর্শনে গীতার কথা বলতে গিয়ে তিনি William Von Humboldt-এর মন্তব্যও তুলে ধরেছিলেন। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাকে গীতার আদর্শ বলে নেহেরু মনে করতেন। তাঁর লেখা Discovery of India গ্রন্থে বলা হয়েছে — 'বুদ্ধের জন্মের অনেক আগে গীতা লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থটির আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর জনপ্রিয়তা কমেনি। বালগঙ্গাধর তিলক থেকে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।'

জওহরলাল চরমপন্থী শ্রীঅরবিন্দের কথা যেমন বলেছেন তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নরমপন্থী গান্ধীজীর কথাও বলেছেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা আমাদের মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় তিনি নিযুক্ত হন। গীতার 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।' (২/৩) শ্লোকটি তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বলেই গীতার আদর্শকে যুবসমাজের কাছে স্বামীজী বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা যেহেতু পরাধীন ভারতের একমাত্র কাম্য তাই সন্ন্যাসীর বিলাসকে স্বামীজী তেমন গুরুত্ব দেন নি। সুভাষচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীতে ধার্মিক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিকেলের আসরে নিয়মিত গীতা পড়ান হত। নেতাজীর প্রবন্ধাবলী ও পত্রে গীতার কথা পাওয়া যায়। শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ 'সৈনিকের স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও একটি জপমালা নেতাজীর নিত্যসঙ্গী ছিল। প্রতিদিন পূজার পরেই তাঁর পরিচারক কুন্দ সিং তাঁর ঘরে ঢুকত। বাংলার বিপ্লবীরা 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' গীতার এই মন্ত্রে যেমন বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' আত্মার এই অবিনশ্বরত্বের বাণী থেকে প্রেরণা নিতেন। নেতাজী ও অন্যান্য বিপ্লবীরা গীতার দ্বারা পরিচালিত হয়েই যুদ্ধে নিজেদের নিঃশেষে দান করতে কুণ্ঠিত হন নি।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়াবার ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের তিলকের কথাই প্রথম বলতে হয়। চরমপন্থী তিলকের গীতার আদর্শে শুধু বিশ্বাসই ছিল না তাঁর কর্মও ছিল গীতা ভিত্তিক। এজন্য মারাঠী ভাষায় 'গীতা রহস্য' নামে একটি অপূর্ব গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সাধন গীতার উদ্দেশ্য এটা তিলকও মনে করতেন। তিনি বলেছেন — ''শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের একটি অতীব ভাস্বর ও নির্মল হীরক খণ্ড। গীতার ন্যায় এমন সরল দ্বিতীয় গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন জগতের সাহিত্যেও দুর্লভ।'' এই গীতাকে স্বদেশী চেতনা জাগাবার কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদ দামোদর হরি চাপেকরের হাতে গীতা তুলে দিয়েছিলেন মহামান্য তিলক। শুধু দামোদরই নয় তাঁর অপর দুই ভাই বাসুদেব ও বালকৃষ্ণও ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। সাক্ষ্য বিবরণ থেকে জানা যায় বিচারের প্রহসন শেষ হবার পরে যখন দামোদরের ফাঁসির রায় শোনান হল তখনও তিনি নিশ্চল। 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।'(২/৩) এই গীতার বাণীকে তিনি শরণ নিয়েছেন। গীতার ২/২২ শ্লোকে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে জীব মৃত্যুর পর নতুন দেহ লাভ করে ইত্যাদি বলা হয়েছে। বিপ্লবীরা এই বিশ্বাসে স্থিতধী ছিলেন বলেই ফাঁসির মঞ্চকে ভয় পান নি। নির্দিষ্ট দিনে পুণার মারবেদ জেলের ফাঁসির মঞ্চে যখন দামোদর আরোহণ করলেন তখন তাঁর হাতে ছিল ভগবদ্গীতা যা বালগঙ্গাধর তাঁকে দিয়েছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীরাও গীতা ও বেদ হাতে নিয়ে দীক্ষা নিতেন গোপন আস্তানায়। রবীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির আস্তানায় এমনটিই দেখেছিলেন। নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন — ''আগের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে সংযমী হয়ে পরের দিন গঙ্গাস্নান করার পর বিপ্লবীর দীক্ষা হত। তখন বিপ্লবীদের মাথায় গীতা ছোঁয়ান হত।'' পি.মিত্র বলেছেন যেভাবে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল সেই ভাবেই পরবর্তীকালে তিনিও বিপ্লবীদের

দীক্ষা দিতেন। কালীমূর্তির সামনে বসে মাথায় দেবীর খড়্গ ও গীতা ধারণ করিয়ে দীক্ষা দেওয়া হোত। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কথা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য —''বর্ণমালা না পড়ে যেমন ভাষার মন্দিরে ঢোকা যায় না, গীতা না পড়ে তেমনি বিপ্লবী দলে প্রবেশ করা যায় না।'' শ্রীঅরবিন্দ বিদেশ থেকে আসার পরে যখন সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নিলেন তখন তাঁর আদর্শ ছিল গীতা। হেমেন্দ্র দাসকে শ্রীঅরবিন্দ দীক্ষিত করেছিলেন গীতা ও কৃপাণ হাতে দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য অনুসন্ধিৎসুরা পাবেন শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যায়।

জাতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে গীতার আদর্শ কতটা অপরিহার্য্য ছিল সেকথা বলতে গিয়ে অনিলবরণ রায় অনুদিত শ্রীঅরবিন্দের গীতা ৫ম খণ্ড থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি — ''গীতা গ্রন্থখানি আশ্চর্যভাবে টিকিয়া আছে। ইহা যখন প্রথমে মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় তখনকার মতই ইহা এখনও তেমনই অম্লান রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত সার বস্তু তেমনি নূতন রহিয়াছে। কারণ সকল সময়েই অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা ইহাকে নতুন করিয়া পাওয়া যায়। ভারতে যে সকল মহান শাস্ত্র ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত গীতা এখনও তাহাদের মধ্যেই গণ্য হয় এবং প্রায় সকল ধর্মমত ও পথই ইহাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও গীতার শিক্ষাকে পরম মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে। ইহার প্রভাব যে শুধু দর্শন ও বিদ্যার অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব সাক্ষাৎ ও জীবন্ত। একটি জাতির একটি সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে ইহার ভাবগুলি প্রবল গঠন-শক্তিরূপে বাস্তবিক কার্য করিতেছে।'' শ্রীঅরবিন্দ তখন মনে করতেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল উৎপাটন করা যাবে না। তাই তিনি বারীন ঘোষ, উল্লাশকর দত্ত, হেম কানুনগো, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের নিয়ে বোমা তৈরির কারখানাও করেছিলেন। এই দলে দীক্ষা নেবার জন্য গীতা স্পর্শ করে শপথ বাক্য পাঠ করা ছাড়া আর কোন বিধি বিধান ছিল না। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

১৫ই এপ্রিল— বাংলা ১৪২৬-এর নববর্ষের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিলাষে বহু ভক্ত সমাগত হয়েছিলেন। এইদিন তপোসিদ্ধা বাংলা পুস্তকটি ও হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীমায়ের সুললিত কণ্ঠে কিছু ভজন ও ভক্তিমূলক গানে নববর্ষের সন্ধ্যাটি সকলের কাছে আশীর্বাদধন্য হয়ে ওঠে।

১৮ই মে — বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ক্রিয়াযোগ সাধন সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় কিছু উপদেশ দেন। এইদিন হিন্দী পুস্তক 'শ্রীশ্রীমা' প্রকাশিত হয়।

১৬ই জুন — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি ভজনের অনুষ্ঠান হয়। পরিশেষে শ্রীমতী লাবণী লাহিড়ী পুরানো দিনের কিছু আধুনিক গান পরিবেশন করেন।

৩০শে জুন — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ৩১ তম পর্বে কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়। কঠোপনিষদ্ সম্বন্ধে বললেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রবচন—১৮ই আগষ্ট, রবিবার সকাল ১১টা
জন্মাষ্টমী — ২৪শে আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা
আধ্যাত্মিক সভা — ২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা
মহালয়া — ২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার
নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ২৯শে সেপ্টেম্বর-৮ই অক্টোবর (১০ দিন ব্যাপী)
৩রা অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠান
৫ই অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
৬ই অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা
৭ই অক্টোবর (নবমী): শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ১৩ই অক্টোবর, রবিবার

व्यासदेव पुत्र शुकदेव

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

पुराकाल में एकबार भगवान शिव भूतगणों से परिवेष्टित होकर देवी पार्वती के साथ कर्णिकावन से परिवृत सुमेरूशृंग में वास कर रहे थे। महर्षि, राजर्षि, लोकपाल, साध्य, वसु, आदित्य, रुद्र, वायु, सरित, सागर, देवता, गन्धर्व, सिद्ध और अप्सरागण एवं सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, नारद, पर्वत, विश्वावसु और अश्विनीकुमार ये समस्त उनकी आराधना में रत थे। उसी समय योगधर्म-परायण महर्षि वेदव्यास भी भगवान शिव के सन्निकट उपस्थित होकर उनके प्रसाद से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश के सदृश गुणसम्पन्न पुत्रलाभ करने की कामना से इन्द्रियसमूह को रुद्ध कर घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार देवादिदेव की आराधना करते-करते व्यासदेव के एकशत वर्ष अतिक्रांत हो गये तथापि उनके तप:शक्ति का ह्रास या किसी प्रकार की ग्लानि उपस्थित नहीं हुई। इस परिदर्शन से त्रिलोक चमत्कृत हो उठा।

श्रीश्रीशुकदेव

तदनन्तर महेश्वर ने उस दृढ़तर भक्ति और कठोर तपोनुष्ठान दर्शन से अतिशय सन्तुष्ट होकर उन्हें वरदान देते हुए कहा, ''द्वैपायन! तुम यथाशीघ्र ही अभीष्ट पुत्र लाभ करोगे। यह पुत्र ब्रह्मपरायण होकर मन, प्राण और बुद्धि द्वारा उनके प्रति ही समर्पित रहेगा। उसके यश: सौरभ से त्रिलोक सुरभित होगा।'' महादेव से वर प्राप्त करने के पश्चात् व्यासदेव परम परितुष्ट हुए तथा अपने आश्रम में प्रत्यावर्तन किया एवं क्लांत देह से होमकार्य करने के मानस से अरणीकाष्ठद्वय ग्रहण कर अग्नि उत्पादन के निमित्त घर्षण करने लगे। इस समय परम रूपवती अप्सरा घृताची आकाशपथ से गमन कर रही थी। उसे देखकर व्यासदेव कामशर से अत्यंत विमोहित हो गये। व्यासदेव की इस प्रकार अवस्था दर्शन से घृताची शुकपक्षिणी का रूप धारण कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई। तब अपनी चित्तचांचल्यता का दमन करने के लिए वे यथासाध्य चेष्टा करने लगे एवं इसके लिए प्रबलवेग से अरणी घर्षण करने लगे किन्तु अपनी चित्तचांचल्यता का दमन करने में समर्थ नहीं हुए। अतएव उस अरणी के ऊपर ही उनका वीर्य स्खलन हुआ एवं व्यासदेव तब और भी बलपूर्वक अरणी मन्थन करने लगे। इस प्रकार उस अरणी से ही द्वितीय व्यासदेव के सदृश तेज:पुंज कलेवर सौम्यमूर्ति ब्रह्मर्षि शुकदेव प्रादुर्भूत हुए एवं यज्ञस्थल में पावक के सदृश शोभा पाने लगे। शुक्रविलोड़न द्वारा उनका जन्म हुआ इसीलिए वे 'शुक' नाम से विख्यात हुए। 'शुक' शब्द का तात्पर्य हुआ अग्नि या वीर्य सम्बंधी। तदनन्तर गंगा देवी ने स्वयं हिमालय से आगमन कर नवजात शिशु को पवित्र सलिल द्वारा देहाभ्यंतरस्थ समस्त नाड़ियों का प्रक्षालन कर स्नान क्रिया का सम्पादन किया। अनन्तर व्यासदेव के उस दिव्यशिशु के जातकर्मादि समापन करने पर शुकदेव के लिए स्वर्ग से दिव्यदण्ड, कमन्डलु और कृष्णाजिन पतित हुए। गन्धर्व तब उनका स्तुति गान, अप्सराएँ नृत्य, वायु दिव्यपुष्प वर्षण और देवगण दुन्दुभि ध्वनि करने लगे। इन्द्रादि देवता, लोकपाल, देवर्षिगण और ब्रह्मर्षिगणों ने भी वहाँ आगमन किया। फलत: तत्काल ही स्थावर-जंगमात्मक समुदय जगत् आनन्द सागर में निमग्न हुआ। तब देवादिदेव महादेव ने पार्वती सहित समवेत होकर प्रीतमन से देवविधान अनुसार शुकदेव की उपनयन क्रिया का सम्पादन किया। देवराज ने प्रसन्न चित्त से शुकदेव को अपूर्व कमन्डलु और दिव्य वस्त्र प्रदान किए। अतुल तेज:सम्पन्न शुकदेव इस प्रकार जन्मग्रहण से ही ब्रह्मचारी होकर समाहित चित्त से कालयापन करने लगे। सरहस्य वेद और वेदांग समुदय अचिरात् उनके हृदय में ज्योतिर्मय हो प्रकट हो उठे। तब उन्होंने धर्मरक्षार्थ देवगुरु

वृहस्पति के निकट समुपस्थित होकर समग्र वेद-वेदांग, इतिहास और राजशास्त्र अध्ययन कर उन्हें दक्षिणा प्रदान कर वहाँ से प्रत्यागमन किया एवं बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य में निरत और समाहित होकर कठोर तपस्या कर ज्ञानयोगबल से समस्त महर्षि और देवताओं के माननीय हो उठे। उसके पश्चात् शुकदेव संसार की अनित्यता प्रभृति विषयों पर सम्यक अवधारणा कर तद्विषयों से उदासीन हुए एवं मोक्षधर्म के अवलम्बन करने के अभिलाषी हुए।

अतएव धर्मात्मा शुकदेव ने अपने पिता से निखिल योगशास्त्र और कपिल-दर्शन का अध्ययन प्राप्त किया। कुछ दिन पश्चात् व्यासदेव ने पुत्र को मोक्षधर्म विशारद और ब्रह्मतुल्य प्रभावशाली देखते हुए कहा ''वत्स! तुम मिथिलाधिपति राजर्षि जनक के निकट गमन करो। वे तुम्हें मोक्षशास्त्र का उपदेश प्रदान करेंगे। तुम प्रस्थान करते समय स्वीय प्रभावबल द्वारा अन्तरिक्षपथ अवलम्बन ना करते हुए एक सामान्य मनुष्य के सदृश अतिविनीत भाव से वहाँ गमन करो। किसी प्रकार से भी मिथिलाधिपति के निकट तिलमात्र भी अहंकार का प्रदर्शन मत करना। सर्वदा उनके वशवर्ती होकर अवस्थान करना। वे अतीव धर्मपरायण, मोक्षशास्त्र विशारद और मेरे यजमान है। वे जो आज्ञा दे, तुम बिना किसी संदेह के उन्हें शिरोधार्य करना।''

राजर्षि जनक की पुरी में गमन करने के पश्चात् शुकदेव के संग राजर्षि की जो लीलाएँ घटित हुईं वह महाभारत महाकाव्य का एक अविस्मरणीय पर्याक है। वहाँ राजर्षि के साथ शुकदेव की विभिन्न सद्विषयों पर अनेक चर्चाएँ हुईं एवं उन्होंने राजर्षि जनक को मायारूपी संसार का आवरणमुक्त एक महान पुरुष समझा। राजर्षि से मोक्षयोग शिक्षालाभ कर परितृप्त हृदय से तब वहाँ से पितृनिवास पर प्रत्यावर्तन कर उन्होंने पितृआज्ञानुसार गार्हस्थाश्रम अवलम्बन किया एवं बर्हिषद पितृगणों में अन्यतम पुलस्त्यनन्दनगण की 'पीवरी' नाम्नी मानसी कन्या से विवाह किया। 'पीवरी' स्वयं योगिनी, योगीपत्नी और योगीजननी थी। इसके पश्चात् व्यासदेव तनय शुकदेव पूर्णसिद्ध आप्तकाम होकर समग्र विश्व पर्यटन करने लगे।

तपोबल से भगवान शुकदेव नित्यलोक गोलोकधाम को प्राप्त हुए थे। द्वापर की कृष्णलीला में देखा जाता है कि समस्त देवी देवता और अन्तरिक्षवासी भक्त देवतागण ने वृन्दावन लीला का आस्वादन करने के लिए वृन्दावन के पशु, पक्षी, कीटपतंग और वृक्ष होकर जन्मग्रहण किया था। शुकदेव थे श्रीराधिका के अतिप्रिय एक शुकपक्षी। श्रीराधा ने उसे मधुर स्वर में 'कृष्ण कृष्ण' नाम बोलना सिखा दिया था। शुकपक्षी ठीक श्रीराधिका के स्वर में ही 'कृष्ण-कृष्ण' नाम बोलता था। एकदिन राधारानी पक्षी को अनारदाना दूध एवं भात खिला रही थी कि उसी समय पक्षी हठात् उड़ कर नन्दग्राम चला गया जहाँ श्रीकृष्ण सखागण से परिवृत होकर कुंज में बैठे थे। वहाँ निकटस्थ एक अनारवृक्ष के डाल पर बैठकर श्रीराधा के सदृश अत्यंत मधुर स्वर में 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर पुकारने लगा। तब कृष्ण विस्मित होकर पक्षी को देखने लगे। उसी समय पक्षी बोल उठा ''उह! मैं अत्यंत दु:खी और मन्दभाग्य हूँ। मैं इतना कृतघ्न हूँ मैं अपनी प्रभुस्वामिनी को छोड़कर चला आया हूँ। तब कृष्ण शुकपक्षी को अपने हाथ में लेकर आदर करने लगे। उसीक्षण ही ललिता और विशाखा, श्रीराधा की दो प्रधान सखियाँ आई और पक्षी को माँगने लगी एवं कृष्ण से कहा कि, 'यह श्रीराधिका का पक्षी है।' लेकिन कृष्ण को छोड़कर पक्षी किसी भी प्रकार से सखियों के पास जाना नहीं चाहता था। तब सखीद्वय माँ यशोदा को बुलाकर ले आई। माँ यशोदा ने आकर कृष्ण से शुकपक्षी को लेकर सखियों को हस्तगत किया एवं कृष्ण को घर लेकर चली गई।

यह शुकपक्षी ही श्रीराधा और कृष्ण के मध्य वार्ता का आदान-प्रदान करता था। जब श्रीकृष्ण और श्रीराधा अपनी भौमलीला परिसमाप्त कर गोलोक प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुत हुए तब शुकपक्षी भी उनके साथ गोलोक में गमन करना चाहता था, किन्तु राधा और कृष्ण दोनों ने ही उससे मर्त्य में रहकर उनकी भागवत-लीला कथा का प्रचार करने के लिए कहा। तब शुकपक्षी क्रन्दन करने लगा किन्तु उन्होंने उससे कहा कि ''तुम्हारे अतिरिक्त उपयुक्त और कोई नहीं है जो भागवत-कथा का पाठ कर सके। श्रीराधा-कृष्ण के गोलोकधाम में गमन करने के पश्चात् शुकपक्षी भागवत कथा कहाँ हो रही है वह अन्वेषण करने लगा। अन्वेषण करते करते अवशेष में कैलाश में शिवलोक जा पहुँचा एवं देखा कि भगवान शिव पार्वती देवी को भागवत-कथा सुना रहे थे। ....इसके पश्चात् की कहानी स्कन्द पुराण में मिलती है, यथा –

कल्पान्तर में नित्यसिद्ध शुकदेव की और एक अभिनव जन्म कहानी स्कन्द पुराण में मिलती है। कैलाश के शिवलोकस्थित किसी एक निभृत स्थान में एकदा महादेव पार्वती को भागवत कथा सुना रहे थे। उसी समय शुकपक्षीरूप में शुकदेव भी वहाँ अवस्थान कर भगवत्-मुखनि:सृत भागवत कथा सुन रहे थे। शिव बोल रहे थे और देवी पार्वती सुन रही थी; यह उनकी धारणा के अतीत था कि अन्य कोई उस स्थान में रह सकता है कारण, भगवत्वाक्य का प्रवाद है कि सम्पूर्ण भागवत-कथा का ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है वे अमरत्व प्राप्त करते हैं। उस समय भागवत-कथा श्रवणकाल के दौरान देवी पार्वती किसी एक समय में निद्राभिभूत हो पड़ी; जब हर पार्वती को भागवत ज्ञान की कथा समझाते हुए बोल रहे थे तब देवी 'हुँ, हुँ' शब्द द्वारा बोधगम्य होने की अभिव्यक्त ज्ञापित कर रही थी। देवी पार्वती के निद्राभिभूत हो जाने पर देवी के स्थान पर शुकपक्षी रूपी शुकदेव 'हुँ, हुँ' करने लगे। समग्र भागवत-शास्त्र विज्ञान सुनाने के उपरांत महादेव का देवी की ओर ध्यान जाने पर देखा कि देवी सो रही है। तब शिव को याद आया कि फिर किसने इतने समय तक 'हुँ, हुँ' शब्द द्वारा बोधगम्य की अभिव्यक्ति ज्ञापित की? हठात् चतुर्दिक दृष्टि डालने पर भगवान शंकर ने पार्वती के पार्श्व में शुकपक्षी को देखा। ब्रह्मविद्या अपात्र को दान हुई है मन में ऐसा सोचकर कुपित होकर भगवान शिव ने शुकपक्षी का वध करने के निमित्त अपना त्रिशूल निक्षेप किया। शुकपक्षी अतीव भीत होकर पलायन करने लगा और शिव-त्रिशूल भी उसका पीछा करने लगा। अवशेष में शुकपक्षी व्यासदेव के आश्रम में पहुँचा। उसी समय व्यासदेव-पत्नी वटिका जलपान करने जा रही थी और उसीक्षण ही शुकपक्षी वटिका के मुख से होते हुए सीधा गर्भ में प्रवेश कर गया। कालक्रम से वटिका गर्भवती हुई किन्तु द्वादश वर्ष तक गर्भ प्रसूत नहीं हुआ। गर्भस्थित शिशु ने गर्भ में रहकर सांगवेद, स्मृतिपुराण प्रभृति का अध्ययन कर लिया। शिशु गर्भ में अवस्थान करते हुए ही स्वाध्याय पाठ करता था। इधर माता वटिकादेवी भी गर्भभार वहन में असमर्थ हो गयी। तब एकदिन व्यासदेव विस्मित होकर गर्भस्थ सन्तान को उद्देश्य कर बोलने लगे, ''तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हो! तुम निष्क्रान्त क्यों नहीं हो रहे? तुम क्या मेरी पत्नी का वध करोगे?'' गर्भस्थ शिशु ने उत्तर दिया –''मैं वास्तव में कौन हूँ वह ठीक से नहीं बोल पाऊँगा। कारण मैंने राक्षस, पिशाच, देव, मनुष्य, गज, तुरंग, कुक्कुट आदि रूप में चतु:सहस्र योनियों में भ्रमण किया है। वर्तमान में मैंने मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त किया है। मैं किसी भी प्रकार से इस गर्भ से नहीं निकलूँगा। मैं योगाभ्यास में रत होकर इसी गर्भ में वास करूँगा, इस स्थान से ही मैं मोक्षलाभ करूँगा।'' व्यासदेव द्वारा बारम्बार बालक को गर्भ से निकलने के लिए अनुरोध से शुकदेव मातृगर्भ से बहिर्गत हुए। जन्म से ही वे द्वादश वर्षीय (मतान्तर अनुयायी १६ वर्षीय) बालक के सदृश प्रतीयमान होने लगे। वे गर्भ से निष्क्रान्त होते ही माता-पिता को प्रणाम कर तपस्या के लिए वन में गमन के लिए उद्यत हुए। व्यासदेव द्वारा पुत्र को गृह में अवस्थान करने के लिए बारम्बार अनुरोध करने पर भी वे सम्मत नहीं हुए। व्यासदेव के साथ उनके पुत्र की गृहस्थाश्रम, संसार की अनित्यता प्रभृति नाना विषयों पर चर्चा हुई। किन्तु व्यासदेव किसी प्रकार भी पुत्र को संसाराश्रम में वास कराने में राजी नहीं कर पाए। शुकदेव ने निवृत्ति-मार्गाभिलाषी होकर समतलभूमि परित्याग कर हिमाचल अभिमुख प्रस्थान किया। वे जब पर्वतशृंगादि अतिक्रम कर क्रमश: अग्रसर हो रहे थे, तब उनके पिता ने व्याकुल होकर उनको आह्वान किया। शुकदेव ने भी ''भो'' इस शब्द का उच्चारण कर प्रत्युत्तर प्रदान किया। उस समय से गिरिकन्दरों एवं अन्यान्य स्थानों में शब्द उच्चारण करने पर, उनके प्रतिशब्द सुनाई देते रहते थे। शुकदेव ने पिता वेदव्यास से महाभारत और भागवत पुराणादि का अध्ययन किया। व्यासदेव ने पुत्र शुकदेव को ही प्रथमबार भागवत सुनाया था। शुकदेव से रोमहर्षण पुत्र सूत उग्रसवा ने भागवत प्राप्त किया एवं उन्होंने नैमिषारण्य में शौनकादि ८८ हजार ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करवाई।

व्यासदेव पुत्र शुकदेव को छोड़कर कभी नहीं रह सकते थे। प्राज्ञबोध से यदि देखा जाए तो परवर्ती युगों में भी भगवान व्यासदेव जब वैष्णवीय धारा में श्रीमद् वल्लभाचार्य की देह में आविर्भूत हुए तब शुकदेव उनके द्वितीय पुत्र श्रीविट्ठल नाथ गोसाँइजी के रूप में आविर्भूत हुए। पिता श्रीवल्लभाचार्य ने ब्रह्म सम्बंधी पुष्टिमार्गस्थित साधना की धारा का प्रचलन किया एवं श्री विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्ग का सम्प्रसारण किया। उसके भी परवर्ती युग में १९ वीं शताब्दी

में देखा जाता है कि भगवान व्यासदेव भगवान किशोरीमोहन के ज्येष्ठ पुत्र श्रीरुद्रदेव के रूप में आविर्भूत हुए। भगवान किशोरीमोहन ने श्रीमद्भागवतगीतोक्त भक्तियोग संस्थापन द्वारा कैवल्यमार्ग का प्रदर्शन किया था। उनके पुत्र 'रुद्रदेव' जन्म से ही परमहंस अवस्था प्राप्त थे। भगवान सर्वदा ही रुद्रदेव को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। रुद्रदेव कभी-कभी अन्यमनस्क होकर इधर-उधर चले जाते थे। श्रीभगवान तब व्याकुलचित्त काशी में घूमघूम कर उन्हें खोजते एवं रुद्रदेव को घर में लेकर आते। पिता का पुत्र के प्रति ऐसा दिव्यभाव सम्पन्न स्नेह, अन्य किसी महात्मा के क्षेत्र में देखा नहीं जाता। यह जैसे एक जन्मजन्मांतर का सुदृढ़ बन्धन था। जब भगवान किशोरीमोहन के देहत्याग का समय हुआ तब भगवान किशोरी बाबा ने अपनी स्त्री से कहा कि रुद्र को वे छोड़ कर नहीं जा सकते। उसे वे पृथ्वी पर लेकर आए हैं एवं उसके निर्दिष्ट स्थान में पुनः उसे छोड़ कर आऐंगे। इसीलिए एक ही दिन में सर्वप्रथम रुद्रदेव ने देहत्याग किया तथा चारदण्ड के पश्चात् श्रीभगवान ने योगबल से देहत्याग किया। –श्रीभगवान किशोरीमोहन और श्रीरुद्रदेव के प्रति निवेदन करती हूँ हमारा भक्तिविनम्र प्रणाम।

।। जय शुकदेव की जय।।

।। जय श्रीविट्ठलनाथ - जय श्रीरुद्रदेव।।

(*सहायक ग्रन्थ : महाभारत, भागवत, स्कन्दपुराण, आनन्द वृन्दावनचम्पू और वृहत् किशोरी भागवत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

– हरि ओम तत् सत् –

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (६४) : उस समय मैं (श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा) Cost Accountancy की पढ़ाई कर रहा था। हावड़ा के अनन्तपुर में कार्यरत था। वह शाखा रूपनारायण नदी के तट (सिद्धेश्वरी कॉटन मिल के समीप) पर अवस्थित थी। ठीक एक महीने बाद मेरी ICWA (Intermediate) की परीक्षा थी। मैं कार्यालय द्वारा दस दिनों की छुट्टी पा गया। तब मैं गुरुजी (श्रीश्री सरोज बाबा) के पास आशीर्वाद हेतु गया। गुरुजी ने कहा, ''तुम अपनी छुट्टी रद्द कर दो। इस परीक्षा में तुम सफल नहीं हो पाओगे।'' हालाँकि मैं अवकाश की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर चुका था इसलिए मैंने उसे रद्द करने की चेष्टा नहीं की। पूर्ववत् तैयारी जारी रखी। वह परीक्षा पहलीबार Computer System से हो रही थी। यद्यपि परीक्षा कक्ष में Instructor ने Computer व्यवहार की पद्धति दिखा दिया था परन्तु मैं nervous हो गया तथा Negative marking के कारण परीक्षा में सफल नहीं हो पाया।

प्रसंग (६५) : मैं (श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा) जिस उच्च-माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय के प्राचार्य थे एक कर्तव्य-परायण एवं अनुसाशन-प्रिय व्यक्ति। उनका आवास हमारे गुरु-महाराज (श्रीश्री सरोज बाबा) के निवास के समीप ही था, वे हमारे गुरुदेव के मित्र थे। वे 'तुलादा' नाम से परिचित थे। इनके अग्रज भी हमारे विद्यालय में शिक्षक थे। यह प्रसंग उस समय का है जब प्राचार्य महोदय के अग्रज अवकाश प्राप्त कर चुके थे तथा व्याधिग्रस्त जीवन जी रहे थे। उनके परिवार के सदस्य अति चिंतित थे। इसी दौरान एकदिन जब मैं गुरुदेव के समीप बैठा था, तभी अचानक गुरुजी ने कहा, ''प्रदीप, तुला के बड़े भाई एक-दो दिनों में ही इस धराधाम से प्रयाण कर जायेंगे।'' सचमुच प्राचार्य महाशय के बड़े-भाई दो-दिन के अन्दर ही परलोक सिधार गये। कई दिनों के पश्चात् प्राचार्य महाशय से जब मैंने इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने यह बताया, ''देखो प्रदीप, चिकित्सक भाई साहब की मृत्यु के संबंध में कुछ भी नहीं बता सके परन्तु तुम्हारे गुरुदेव ने सही समय बता दिया। यह त्रिकालदर्शी महात्माओं के पक्ष में ही संभव है।''

प्रसंग (६६) : मेरी माँ ने गुरुदेव (श्रीश्री सरोज बाबा) के घर जाने के कई महीनों बाद गुरुदेव से कहा कि वे एकबार हमारे गृह पधारकर अपने चरण-धूलि से इसे पवित्र करें। गुरुदेव ने कहा, ''माँ, आगामी रविवार प्रातः ८ बजे आपके घर आऊँगा।'' माँ ने उनसे पूछा कि वे तो

हमलोगों के घर कभी आये नहीं तो कैसे घर को पहचानेंगे? बाबा ने कहा, ''माँ मैं सही घर पहचान लूँगा।'' यह सुनकर हमलोगों को असीम आनन्द हुआ। निर्दिष्ट तिथि को माँ ने यथारीति फूल-चंदन से बाबा के आने के पथ को सजाया। इधर ९ बजने वाले थे पर बाबा नहीं आये, माँ खूब अधीर हो गयी, तत्पश्चात् ठीक नौ बजे बाबा के गृह-आश्रम से चार गुरुभाई साईकिल पर सवार होकर आये, जो थे बापीदा, असीमदा, मिठुन एवं अंजन डाक्टर। माँ ने गुरुभाईयों से पूछा, ''वे कब आयेंगे?'' उन्होंने कहा, ''बाबा नहीं आयेंगे, हमलोगों को भेज कर यह कहा है कि तुमलोग देखना प्रदीप के घर के पूर्वाभिमुख एक हरे रंग का दरवाजा है, उस दरवाजा से प्रवेश करने पर देखोगे फर्श पर चंदन से अंकित रंगोली एवं श्वेत एवं गुलाबी फूल उस पर बिछे हैं फिर देखोगे कि वह पुष्प-पथ उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गया है एवं वहाँ से पूर्व की ओर मुड़ कर एक कमरे में प्रविष्ट हो गया है वहाँ पर देखना पूर्वाभिमुखी एक आसन बिछाया हुआ है, उसके सामने एक प्रदीप प्रज्ज्वलित है, एक कांसा की थाली में विभिन्न प्रकार के पुष्प विराजित हैं। मेरे गुरुभाईयों के द्वारा इतना सब कहने पर भी मेरी माँ के कानों में ये बातें प्रवेश की हैं ऐसा नहीं लग रहा था। सर्वप्रथम माँ खूब क्रोधित हो गयी, तत्पश्चात् बहुत रोने-धोने लगीं। गुरुभाई माँ को यह समझा रहे थे, ''माँ आप बिल्कुल चिन्ता मत कीजिए, बाबा सूक्ष्म शरीर में इस आसन पर विराजमान है।'' माँ ने कहा, ''इन मन बहलाने वाली बातों पर मुझे विश्वास नहीं है।''

बाबा प्राय: महाभाव में रहते थे, जैसा हमलोग चैतन्य महाप्रभु में देखते हैं, मानों बाबा हमेशा आद्याशक्ति महाशक्ति की लीला इस महाविश्व के मध्य देख सकते थे, इसी लिए बाबा भाव के आनन्द में तन्मय रहते। एक दिन बाबा अचानक नंगे पैर हमलोगों के गुरुभाई बाबलादा के घर के लिए निकल पड़े। बाबा का आवास बाकसड़ा एवं बाबलादा का निवास रामराजातला, दूरी काफी अधिक थी। पथ काफी टूटा-फूटा था। प्राय: सारा रास्ता टूटकर उसमें बड़े-बड़े गड्ढे बन गये थे। बाबा उनके ऊपर से सहज गति में पैदल चले गये। जिज्ञासा करने पर बाबा बोले, ''स्वयं माँ आद्याशक्ति दुर्गा ने रास्ते पर नरम मखमली चादर बिछा दिया था। मैं भी उसके ऊपर चलकर महाआनंद में आगया।''

कभी-कभी, मुझे ऐसा लगता है कि कक्षा चार या कक्षा पाँच के विद्यार्थी के समतुल्य ज्ञान नहीं रहने पर भी मैं अपने श्रीगुरुमहाराज एवं श्रीश्रीमाँ की कृपा से धन्य हूँ।

प्रसंग (६७) : श्रीश्री सरोज बाबा की अमृत वाणी जो एक उन्नतवान क्रियावान द्वारा संकलित है तथा वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं उनकी ही जुबानी –

लाहिड़ी बाबा (जिन्हें हमसब दादा नाम से संबोधित करते थे) उनकी अमृत-वाणी एवं उपदेश –

१) क्रिया लेते समय फूल-माला कम हो जाने पर बाबा ने कहा, ''वाह्यिक फूल की माला से क्या होगा, अपने देहाभ्यन्तरस्थ पद्मों को प्रस्फुटित करो, फिर इसे गुरु को समर्पित करना।

२) क्रिया सदा ही रक्षा कवच है।

३) तुम्हें अगर तीस कोस (दूरी की माप) का पथ तय करना हो, तो तुम्हें अकेले ही चलना होगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, परन्तु मैं तुम्हारे समीप ही रहूँगा ताकि तुम यह न समझ सको कि कैसे इतनी दूरी तुम अपने मित्र का हाथ पकड़कर आगे निकल आये।

४) पुष्प प्रस्फुटित करो, देखना मधुमक्खियाँ अपने तुम्हारे आसपास मँडराने लगेंगी। तुम्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा।

५) आत्म-नारायण सत्ता के सभी अपराध क्षमा कर देते हैं किन्तु सत्ता की इन्द्रियों से जुड़ा रिपु का अहंकार कभी भी क्षमा नहीं करते।

६) पतंग चाहे जितना भी ऊँची क्यों न उड़े, धागा एवं लटाई मेरे ही हाथ में है इच्छानुयायी उसका रंग बदलने से ही तो सब हो गया।

७) जिसने मेरी दुकान पर आकर एक बार घी का स्वाद चख लिया है उसे लौटकर फिर मेरी ही दुकान पर आना पड़ेगा।

८) चाहे मेरे गुरु मदिराशाला जाय, तथापि मेरे गुरु नित्यानंद राय।

९) मुझे रोज गो-मांस खाना पड़ता है (वाह्यिक गोमांस नहीं)। गुरु कृपा से जानना होगा गुरुमुखी गुप्त विद्या।

...क्रमश:

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

उन्मेष

(२७)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

(गतांक से आगे...)

श्रीश्रीमाँ – प्रत्येक मनुष्य का अन्त:स्थित स्वभाव अलग होने के कारण ब्रह्मविज्ञान को ज्ञात होने की साधना की

पद्धति या ब्रह्मविद्या का कौशल एक होने पर भी साधक की अनुभूति उपलब्धि सब विचित्र होती है। सृष्टि मध्य प्रत्येक चेतना के स्तर पर मूल सर्वव्यापी चेतना की जो अनुभूति रहती है, वह सब किन्तु एक होती है। सर्वव्यापीत्व में अखण्ड चेतना की अनुभूति भी एक होती है, किन्तु सृष्टि रहस्य को भेद करने के पथ पर चलते समय जो दृश्य देखे एवं उपलब्धि किये जाते हैं वे प्रत्येक साधक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार होने के कारण ही इतने धर्मग्रन्थों की सृष्टि हुई है। धर्मग्रन्थ विभिन्न होने पर भी अनुभूति, दर्शन या उपलब्धि में बोध का प्रकाश एक ही रहता है। सिर्फ अपनी सत्तागत उपलब्धि की भाषा अलग होती है। जैसे, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कूटस्थ के बारे में लिखा है, ''नयन जिसे खोजते फिरे, नहीं मिलता ठिकाना, अरे! उसे क्या जा सकता है जाना?'' फिर एक अन्य गाने में लिखा है –''तुम क्या केवल छवि हो, केवल पट पर अंकित, वह है मात्र नीहारिका'' –'नीहारिका' तारा का एक पुंज है, जिसे कूटस्थ के गगनमंडल में योगीगण नित्य दर्शन करते हैं। फिर देखो, सूफी संत यारी साहेब ने लिखा है – ''झिलमिल झिलमिल बरसे नूरा, नूर जहूर सदा भरपुरा'' – 'नूर' का अर्थ है ज्योति। झिलमिल झिलमिल ज्योति के वर्षण से गगन आच्छादित है! – ब्रह्ममय अन्तर्जगत के दर्शन आदि को इसप्रकार साधक योगीगणों ने अपनी उपलब्धि की भाषा द्वारा व्यक्त किया है। नजरुल ने लिखा है – ''सिन्धु में 'माँ' के बिन्दु स्वरूप, छिठक्कर पड़ते है जैसे माणिकरूप'' – इस ब्रह्माणुसम ज्योतिर्बिन्दु के विषय में ही लिखा है; ''तारा'' शक्ति का विषय है; जिसे हम तारादेवी रूप में पूजा करते हैं – उसी तारा माँ के तत्त्व-विषय। कालीरूपा काल के तम:पूर्ण आकाश के वक्ष पर जब तारादेवी का आविर्भाव होता है, तब ब्रह्माणु आदि दल परमब्रह्म के असीम आकाश से नि:सृत होकर सृष्टि मध्य क्रमान्वय ससीम की परिसीमा में आते रहते है, वे चिदणु के दल, वही है ''तारा'' शक्ति। एकदम पुंज-पुंज नक्षत्रों सम असीम आकाश वक्ष पर देखे जाते हैं। ये दर्शनादि अपनी धारणा द्वारा जो साधक जिस प्रकार उपलब्धि करते हैं वे उसे उसी प्रकार भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं। जो ये दर्शन करते हैं वे मनुष्य नहीं रहते, ऋषि हो जाते है। फिर कोई-कोई ऋषि ऐसे भी हैं जो दर्शन करते हैं और वे निर्वाक् हो जाते हैं।

बचपन में मेरा एक स्वभाव था, छत पर जाकर मेघाच्छन्न आकाश में विद्युत् की चमक को देखना। कालवैशाखी की आँधी देखना भी मुझे अच्छा लगता था। कालवैशाखी की आँधी आने के पूर्व के आकाश को देखने के लिए मैं अपने घर की छत पर घूमती थी; विद्युत् देखना अच्छा लगता था। अन्धकार घनघोर घटा एवं काले मेघ का दर्शन भी मन को भाता था। – प्रकृति का रुद्र रूप देखकर भी मुझे भय नहीं लगता था। बारिश में भींगना भी अच्छा लगता था। आकाश में चमकती बिजली देखना मुझे क्यों अच्छा लगता था, यह मैं भी नहीं जानती। मेरे वर्तमान जीवन में सिद्ध अवस्था में आकर मैंने समझा कि विद्युत् देखना क्यों अच्छा लगता है? – इसकी उपलब्धि अभी मैं कर पाई हूँ। – यह मेरे जन्मजन्मान्तर के संस्कार हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई इस स्थूल जगत् के आकाश की ओर थोड़ी देर ताकता रहे तो आकाश को देखते-देखते उसका निज का 'अहंकार' चला जायेगा; वह समझ जायेगा कि इस समग्र विश्व के मध्य ''मैं'' एक चींटी से भी क्षुद्र जीव मात्र हूँ। जिन्होंने इस विशाल की सृष्टि की है, वे तब कितने बड़े हैं? कितने सुन्दर है? रात के घने अन्धकार में आकाश के वक्ष पर छोटे-छोटे ग्रह-नक्षत्र के समावेश से मद्धिम प्रकाश देकर उन्होंने कितनी सुन्दरता से धरित्री को सजाया है। ''मैं'' तो वहाँ अति तुच्छ ही हूँ ना!

...क्रमश:

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२३)

मुनिभिः पन्नगैर्व्वापि सुरैर्व्वा शापितो यदि।
कालमृत्यु भयाद्वापि गुरुरक्षति पार्व्वति।।७२

हे पार्वति, मुनिभिः वा पन्नगैः यदि वा सुरैः अपि (कश्चित् पुरुषः) शापितः (भवेत्) वा (अथवा) (सः पुरुषः यदि) कालमृत्युभयात् (आक्रांतो भवेत्), (गुरुभक्तं तं पुरुषं) गुरुः (सदैव) रक्षति।।७२

मुनि (अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मध्यान में जो निमग्न रहते हैं), पन्नग (अर्थात् सर्प, जो सब अविलम्ब मृत्यु को आनयन करता है); सुर (अर्थात्, सुरलोकवासी देवता); अगर ये रुष्ट होकर गुरुभक्त पुरुष के प्रति अभिशाप प्रयोग करें तो उस गुरुभावापन्न पुरुष की गुरु ही शापफल से रक्षा करते हैं (कारण गुरु के प्रति शाप प्रयुज्य नहीं होता); अथवा कालस्वरूप मृत्युभय से भी गुरु रक्षा करते हैं। ७२

गुरुभक्त जीव गुरुप्रसाद से गुरु हो जाते हैं एवं देह का बंधन अतिक्रम करते हुए देहातीत अवस्था लाभ करते हैं। मृत्यु-भयादि अशुभ घटना देहसम्पर्क से ही होती हैं; जिनकी देह है, वह व्यक्ति ही देह की शुभाशुभ घटना में स्वयं लिप्त है, ऐसा समझना होगा एवं जिनकी देह नहीं है उसका फिर शुभाशुभ क्या हो सकता है? अतएव उस व्यक्ति ने शापफल अतिक्रम किया है; देह की ही मृत्यु होती है, जिनके देह नहीं है, उनको मृत्युभय होगा ही क्यों?

अशक्ता हि सुराः सर्व्वे अशक्ता मुनयस्तथा।
गुरुशापहताः क्षीणा क्षयं यान्ति न संशयः।।७३

सर्व्वे सुराः अशक्ताः, तथा सर्व्वे मुनयः अशक्ताः हि (निश्चितं), गुरुशापहताः संतः क्षीणाः, (ते) क्षयं यान्ति, (अत्र) संशयः न (नास्ति)।।७३

परन्तु मुनिगण, सुरगण सब ही अशक्त है, ऐसा समझना होगा (कारण मुनिगणों की अवलम्बन-च्युति से पतन की आशंका रह जाती है एवं सुरगणों की भी जगत् के सम्पर्क में आकर स्वर्ग से च्युत होने की सम्भावना है), ये सब गुरुशापग्रस्त होने से क्षीण होकर क्षयप्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है।।७३

मुनि प्रभृति सब जबतक गुरु के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक उनसब को देहधारी कहकर समझना होगा आत्मसमर्पण होने से गुरु भावापन्न होंगे, तब शाप अथवा मृत्युभय नहीं रहता।

मन्त्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्वयम्।
श्रुतिवेदान्तवाक्येन गुरुः साक्षात्परं पदम्।।७४

हे देवि, गुरुरिति अक्षरद्वयरूपम् इदं पदं मन्त्रराजं, श्रुतिवेदान्त वाक्येन (कथितं), गुरुः साक्षात् परंपदम् (एव जानीहि)।।१४

गुरु यह पद 'गु' एवं 'रु' द्वि-अक्षर से गठित है, यही मन्त्र श्रेष्ठ हैं। 'मन्त्र' अर्थात् मन के उद्धार का कारण स्वरूप है इसीलिए इसे मन्त्र कहा जाता है, अर्थात् मन अन्धकारमय जगत् से आवृत है एवं उसके उद्धार का हेतु होते हैं गुरु। गुरुस्थान ऊर्द्ध में है, वही परमपद कहकर जाना जाता है - श्रेष्ठत्व के कारण वे परम हैं, अन्धकार के पार उनकी स्थिति है इसीलिए वे परमपद कहकर कथित होते हैं। यद्यपि गुरु का अस्तित्व सर्वत्र है, तथापि वे अपने स्थान से च्यूत नहीं होते, जैसे सूर्य और सूर्य का आलोक - सूर्य का आलोकस्वरूप रूप सर्वत्र ही है, तथापि सूर्य कभी भी अपने स्थान से च्यूत नहीं होते। सूर्य स्थिर भाव में हैं, परन्तु जगत् घूम रहा है, जगत् के जीव भी जगत् के साथ-साथ घूम रहे हैं इसीलिए वे सूर्य का उदयास्त अनुभव करते हैं; जब तक सूर्य समीपस्थ रहता है, तबतक वे सूर्यालोक का अनुभव करते है, जब जगत् व्यवधानस्वरूप होकर सूर्य उसके अन्तराल में आ जाता है तभी वह अन्धकारमय जगत् के मध्य घोर निद्रा में अभिभूत रहता है। सूर्यस्वरूप गुरु का रूप आलोकस्वरूप होता है, यही कारण है उन्हें शास्त्र में ज्योतिर्मय कहा जाता है, उसी आलोक के अवलम्बन से जिनकी सूर्यपद में गति होती है, उनको और अन्धकार की अनुभूति नहीं होती, वे चिरकालव्यापी आलोक में ही रहते हैं, इसे ही जीव का उद्धार कहते हैं, अर्थात् जीव के ऊर्द्धगामी होने पर दृष्टि के अन्तराय-स्वरूप जगत् का व्यवधान घटता है, इसीलिए उनका उद्धारसाधन होता है। आलोक-सह-अन्धकार के मध्य से जीव की गति होती है,

जीव को ओंकारध्वनि (नादश्रुति) श्रुतिगोचर होती है, यह जीव को प्रबुद्ध कर दिखा देता है एवं कहता है, ''जीव देखो, यही अन्धकार है, एवं यहीं तुम आबद्ध हो; उपरिभाग में ज्ञानस्वरूप सूर्यदेव हैं, उनके ही आलोक से तुम्हें ज्ञान होता है कि यह अज्ञान एवं वह ज्ञान, एवं उनके ही अनुग्रह से तुम अन्धकारमय जगत् में जीवन धारण करने में सक्षम हुए हो।'' इस प्रकार सूर्यदेव को देखते-देखते जीव द्वारा अन्धकारमय जगत् का अतिक्रम करने पर, जीव का जगत्स्वरूप आवरण दूर हो जाता है, इस प्रकार जानना शेष हो जाता है, जीव सूर्यालोक में स्थितिसम्पन्न होता है। यही वेद और वेदान्तर अवस्था है, जो वेद और वेदान्तवाक्य द्वारा परोक्षरूप से कथित होता है। यह अनुमान नहीं है परन्तु साधनकर्म के द्वारा प्रत्यक्षरूप से समझा जाता है एवं प्रत्यक्ष जाना जाता है इसीलिए गुरु ही साक्षात् परमपद। उस पद का साक्षात् होने पर जीव क्या समझता है? – वह समझता है कि अप्रकाश गुरु ही इस पद रूप में प्रकाशमान होकर हैं। ७४

...क्रमशः

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

पुराण कथा

महर्षि मुद्गल

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

अजमीढ़ वंशी अर्क के पुत्र थे हर्यश्व। इन्हीं हर्यश्व के पाँचों पुत्रों में अन्यतम थे 'मुद्गल'। इन्हीं मुद्गल प्रसूत क्षत्रियगण तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 'मौद्गल्य' के नाम से जाने जाते हैं।

महर्षि मुद्गल ने दक्षिण-समुद्र तटवर्ती फुल्ल नामक ग्राम में एक यज्ञ संपादित किया। भगवान नारायण उस यज्ञ की हविः ग्रहण करने हेतु भगवती लक्ष्मी देवी के साथ वहाँ उपस्थित हुए एवं यज्ञ की हविः पान कर अत्यन्त संतुष्ट हुए। इसके पश्चात् भगवान विष्णु द्वारा मुद्गल को वर प्रार्थना हेतु कहने पर मुद्गल ने कहा –''मैं प्रतिदिन दोनों समय इस स्थल पर यज्ञाग्नि में दुग्ध-धारा द्वारा हवन करने की इच्छा करता हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करें।'' तब भगवान ने सुरभी को बुलाकर कहा, ''मेरा यह भक्त प्रतिदिन इस स्थल पर दुग्ध-धारा द्वारा हवन करेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम प्रतिदिन यहाँ आकर अपनी दुग्ध-धारा से यह सरोवर पूर्ण करोगी।'' तभी से मुद्गल प्रतिदिन दुग्ध द्वारा नारायण हेतु हवन संपन्न करते। इस प्रकार बहुत वर्ष बीतने पर काया-त्याग होने के पश्चात् वे विष्णुलोक गये।

स्कन्द-पुराण में एक जगह इन्हीं महर्षि मुद्गल से संबंधित और एक कहानी है – एकबार किसी समय महर्षि मुद्गल अर्ब्बुद पर्वत पर अपने आश्रम में बैठे हुए थे, इसी समय देवराज इन्द्र के यहाँ से एक दूत ने आकर उनसे कहा –''आपको ले आने के लिए देवराज ने मुझे भेजा है।'' इसपर मुद्गल ने कहा –''मैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। मैं मर्त्यलोक में ही रहकर महेश्वर की आराधना करूँगा।'' तब देवदूत ने विविध प्रकार से महर्षि मुद्गल के समक्ष स्वर्गलोक की शोभा का वर्णन किया। परन्तु इतने पर भी मुद्गल ने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। तब स्वर्ग में प्रत्यागमन कर देवदूत ने देवराज इन्द्र को सारी जानकारी दी। दूत के अकेले लौटने पर देवराज इन्द्र अतिशय क्रुद्ध हुए एवं ऐन केन प्रकारेण मुद्गल को स्वर्ग ले आने हेतु पुनः दूत को आदेश दिया। इन्द्र की आज्ञा से दूत के पुनः मुद्गल के पास जाने पर महर्षि मुद्गल ने तपोबल से उसकी गति को स्तंभित कर दिया। इधर दूत के आने में विलंब होते देख देवराज स्वयं अनुसंधान हेतु बाहर आये एवं महर्षि मुद्गल के आश्रम के निकट आकर दूत को स्तंभित अवस्था में देखा। तब पुरन्दर अति क्रुद्ध होकर मुद्गल का वध करने हेतु वज्र लेकर आगे बढ़े। परन्तु महर्षि मुद्गल ने केवल दृष्टिपात से ही वज्रधारी इन्द्र को स्तंभित कर दिया। तब इन्द्र शंकित होकर मुद्गल से क्षमा-प्रार्थना कर मुक्त हुए। तत्पश्चात् देवराज ने प्रत्यावर्तन किया। मुद्गल ऋषि ने पूर्व के सदृश ब्रह्म-ध्यान-परायण होकर कालक्रम से मोक्षप्राप्त किया।

मोक्षप्राप्तगणों को ही विष्णुलोक या वैकुण्ठलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की अपेक्षा मोक्षपद श्रेष्ठ है, इस उपाख्यान द्वारा जगत् के साधक योगीस्वरूप ऋषि-मुनिगण यही शिक्षा प्राप्त करेंगे।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

पंचकेदार के पथ पर

(२)

गौरीकुंड से सोन-प्रयाग होते हुए गुप्तकाशी, वहाँ से पैदल पथ आरंभ होता है। रास्ता पार करने के पश्चात् वनों से भरा हुआ पतला पैदल पथ। अवरोहण पथ द्वारा कालीगंगा तट पर उतर आये। कालीगंगा के ऊपर से काष्ठ-सेतु द्वारा उस पार जाने पर विशाल अरण्य। बॉयीं तरफ पर्वत से सटे हुए कई पदचिह्न। पहाड़ीलोगों की धारणा है कि ये सब द्वितीय पांडव भीमसेन के पदचिह्न हैं। एकांत जंगल-पहाड़ से सटे हुए स्पष्ट पदचिह्न देखकर सचमुच आश्चर्यजनक लगता है। इस पर किसी प्रकार का तर्क न कर आगे बढ़ गया। जंगल की सघनता से सूर्य की किरणों को भूमि तक आने में असुविधा हो रही थी। मौन ऊँचे ऊँचे देवदार, पाइन, फार एवं अन्जाने कई असंख्य ऊँचे पेड़ों ने अरण्य की नीरवता कायम रखी है। बीच-बीच में पक्षियों का कलरव, पेड़ से गिरते हुए पत्तों की खस-खस आवाज, गिलहरियों का पेड़ों पर चढ़ना-उतरना अनायास ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते है। हिमालय के पथ पर प्रति पदक्षेप प्रकृति अपना रूप, रंग बदलती रहती है। जंगल पार कर पर्वत के ऊपर से होते हुए रास्ता सीधा जाता है कालीमठ को। दूर से छवि की तरह दिखाई देता है।

कालीमठ

शाम के पाँच बजे हैं। आ पहुँचे हिमालय के निर्जन परिवेश में अवस्थित कालीमठ में। आसपास कई सुप्राचीन मन्दिर हैं। सुदूर अवस्थित स्थानीय आदिवासियों के टूटे-फूटे घर दिखे। प्रकृति के साथ संघर्ष के उपरांत बचे हुए ये आदिमानव। किशोर-किशोरी, तरूण-तरूणियों की मौन अभ्यर्थना, तथा नन्हें शिशुओं के हाथों के संकेत। काली-गंगा एवं सरस्वती-गंगा का संगम है कालीमठ के पास। मंदिर समिति के धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था हुई।

प्राचीनकाल में कालीमठ में नरबलि की प्रथा थी। ग्राम के सबसे कनिष्ठ संतान की बलि दी जाती थी। क्रमशः ग्राम का जन्म-दर घटने लगा। कोई भी संतान को जन्म देने का साहस नहीं कर पाता। एकबार एक वृद्धा की इकलौती पौत्री की बारी आयी। ग्राम की वह अबोध बालिका सर्वकनिष्ठ चुनी गयी। परन्तु वह वृद्धा अपनी पौत्री को बलि हेतु सौंपने के लिए राजी नहीं हुई। उसके बदले उस वृद्धा ने स्वयं को बलि हेतु प्रस्तुत किया। अष्टमी पूजा के दिन वृद्धा की स्नान, नववस्त्र परिधान एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, पुजारी ने उत्सर्ग मंत्र का पाठ किया। दूसरी तरफ शिशु-कन्या के आर्तनाद से देवता का हृदय पिघल गया। मातृहीन कन्या के क्रंदन से दैववाणी हुई। हठात् पुजारी संज्ञाहीन हो गये, अचेतन पुजारी के मुँह से नरबलि निषेध का निर्देश निर्गत हुआ। वृद्धा को जीवनदान मिला। द्वितीयबार दैववाणी द्वारा अज अथवा महिष बलि का आदेश हुआ। उसी समय से कालीमठ में महाष्टमी के दिन बकरे अथवा महिष की बलि दी जाती है। साल में इसी एक विशेष दिवस को मंदिर के गर्भगृह की सफाई की जाती है। उस दिन आधी रात को आँख पर पट्टी बाँधकर पुजारी सुरंग के मुख का ढक्कन (प्रस्तर) हटाते हैं। पुजारी अपने हाथों से भीतर की सफाई करता है। उस समय वे भीतर अवस्थित देवी मूर्ति को स्पर्श करते हैं। किंवदंती है कि अगर पुजारी देवी-मूर्ति को देखने का प्रयास करेंगे तो दृष्टिहीन हो जाऐंगे। पुराकाल में ऐसी घटना घटी थी ऐसा सुना गया। उस घटना के पश्चात् पुजारी आँखों की पट्टी हटाने का साहस नहीं करते।

एक रात्रि कालीमठ में अतिवाहित कर पुनः चलना आरंभ किया। सरस्वती-गंगा के सेतु को पार कर दॉयी तरफ वाला रास्ता पकड़ा। बॉयी तरफ सघन वन, दॉयी तरफ मदमहेश्वर-गंगा। नदी के तट का मनोहर रास्ता। बीच-बीच में चढ़ाई-उतराई। कहीं-कहीं टूटा रास्ता। लोक कल्याण-विभाग के लोग मरम्मत के कार्य में व्यस्त दिखे। कालीमठ से तीन घंटे चलने पर आता है लेंक। पहाड़ी जनपद, रास्ता से थोड़ा नीचे समतल भूमि पर एक प्राथमिक विद्यालय है। लेंक से आरंभ होता है आरोहण पथ। और तीन किलोमीटर पथ चलने के पश्चात् आता है उनिआना ग्राम। आगे बढ़ता गया। और ४ किलोमीटर पथ चलकर आ पहुँचा राँशु।

ऊँचाई ६५०० फुट। हिमालय की एक सुप्राचीन बस्ती। प्राचीन पहाड़ी ग्राम, प्राय: सारे घर कच्ची मिट्टी के बने हैं। ग्रामके भीतर है देवी राकेश्वरीमाता का मन्दिर। मन्दिर के पुजारी ने अपने आवास में ही एक रात ठहरने की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन प्रात:काल ही पथ यात्रा आरंभ हुई। सामने एक दूसरा पहाड़ी ग्राम दिखा गौभार। वहाँ से चला वानतौली, जो एक किलोमीटर की दूरी पर है। वानतौली को पीछे छोड़ कर बढ़ता गया। चार किलोमीटर रास्ता तय करने के पश्चात् आ पहुँचा नानु। अभी और पाँच किलोमीटर का रास्ता तय करना था।

मदमहेश्वर

मध्यान्न-भोजन समाप्त कर आगे बढ़ा। आगे पाँच किलोमीटर का रास्ता केवल चढ़ाई का एवं वह सघन वन से होकर गुज़रता था। घनघोर जंगल में बीच बीच में रूककर विश्राम करना पड़ता था। सुरागाय (याक) एवं वनमहिष रास्तें में खड़े होकर पथावरोध करते। मनुष्य की उपस्थिति से परेशान होकर वे रास्ते को छोड़कर वन में प्रवेश कर गये। अस्ताचलगामी सूर्य की रश्मियाँ मदमहेश्वर और चौखम्बा के तुषार शिखर पर पड़कर लाल रंग की आभा प्रदान कर रहीं थी। प्रकृति के हरित अंग पर रक्तिम आवरण। सारी थकान मिट गयी। गोधूलि में मदमहेश्वर के आँगन में देवदर्शन। मदमहेश्वर मन्दिर के दो भाग हैं, सम्मुख भाग के मध्यस्थान पर नंदी-मूर्ति, बॉयी तरफ गणेशजी, दॉयी तरफ वीरभद्र एवं असंख्य मूल्यवान पूजन-पात्र। पश्चात् भाग में मूल मन्दिर एवं गर्भ-मन्दिर। गर्भगृह में धातुनिर्मित लिंगमूर्ति; जिसके पदतल में शिलामूर्ति। प्रवेशद्वार के भीतर, दॉयी तरफ रखी है नक्काशी की हुई डोली। शीतकाल में देवता की लिंगमूर्ति डोली पर उठाकर ऊखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। मूल मन्दिर के पीछे और दो छोटे मन्दिर, उनमें से एक में गौरी-शंकर की युगल-मूर्ति एवं दूसरे में माता पार्वती की मूर्ति विराजित है। मन्दिर परिसर में दो शीतल जल-कुंड हैं। पहला स्नान-कुंड, दूसरा शारदा-कुंड। मन्दिर के पुजारी जी ने सुनाया मदमहेश्वर की कहानी – वर्तमान का यह हरित क्षेत्र, पुराकाल में सघन वन से ढँका हुआ था, अरबी व्यापारीगण इस क्षेत्र को गायों के चारागाह के रूप में प्रयोग करते। एकबार एक दुग्धवती गौ ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। गौ से दूध अप्राप्य होने पर गाय के मालिक ने उसका अनुसरण किया। उन्होंने देखा कि उस गाय ने सघन वन में प्रविष्ट कर एक शिलाखण्ड पर अपना सारा दूध गिरा दिया। यह दृश्य देखकर उस व्यापारी ने क्रोधित होकर एक प्रस्तर खंड से उस गाय पर आघात करने की प्रचेष्टा की। दैवयोग से वणिक द्वारा फेंका गया पत्थर उस शिलामूर्ति से जा टकराया, गाय ने कूँदकर अपनी जान बचायी एवं शिलामूर्ति टेढ़ी हो गयी। उसी रात उस व्यापारी को स्वप्नादेश हुआ। वणिक ने उस शिलामूर्ति के ऊपर मन्दिर निर्मित कर देवता की पूजा का प्रचलन आरंभ किया। यह कहानी सुनने के पश्चात् मैं बाहर आया। देखा कि तुषारपात आरंभ हो गया है। ठंड की तीव्रता बढ़ने लगी। आगामी दिन सुबह में बाहर निकलते ही अवाक् हो गया। संपूर्ण मन्दिर परिसर श्वेत वर्ण के आवरण से आवृत है। चौखम्बा, मदमहेश्वर के तुषार-धवल अंग पर रक्तिम आवरण। पुन: पथ पर उतर आया एवं बढ़ चला। इसबार गंतव्य तृतीय केदार - तुंगनाथ। गढ़वाल हिमालय का सर्वोच्च गुहा-मन्दिर। द्वितीय दर्शन के पश्चात् तृतीय संधान की यात्रा। *...क्रमश:*

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

सूचना : अनिवार्य कारणवश 'श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन' का प्रसंग इस संख्या में प्रकाशित नहीं किया जा सका। परवर्ती संख्या में वह प्रकाशित किया जाएगा।

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

१०। (पत्र १०, प्र: २) - (प्रथम भाग) गुरुदेव कृपायुक्त १०८ थे। यही है अनन्तभाव। किन्तु देहावसान के साथ-साथ अनन्त का अंत या आठ की समाप्ति होने के पश्चात् १०९ में प्रवेश हुआ है। इसीलिए वे पुन: आविर्भूत होने में सक्षम हैं। १०८ में जिस योगी का अवसान होता उनके पक्ष में लौटकर आना संभव नहीं होता। – (इस विषय पर श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य)।

उत्तर – (पत्र १०, प्र: २, प्रथम भाग) – विशुद्धानंद परमहंसदेव ने जगत् के जीव कल्याण एवं अध्यात्म विज्ञान योग प्रतिष्ठा करने हेतु सद्गुरु परम्परा में स्थूलदेह धारण किया था। उनका अध्यात्म जीवन था, संत सद्गुरुमंडल द्वारा परिचालित 'कृपायुक्त योग' साधना व पूर्ण सिद्धि। ज्ञानगंज के योगानुसार वे योग चेतना स्तर के १०८ पर्याय में उन्नीत होकर चिद् या पुरुषोत्तम अवस्था में उपनीत हुए थे। यहीं पर योगी आत्मदर्शन एवं आत्मउपलब्धि की महिमा से विराट् के अनंतभाग की प्राप्ति करते हैं। इस अवस्था में योगी विशुद्ध गुरु हो जाते हैं। यहीं आत्मज्ञान-योग की पूर्णता होती है। श्रीमत् विशुद्धानंददेव देहरक्षा के पर्यन्त १०८ के अनंत भाव के चिदाभास को धारण कर पूर्णभाव में थे। तिरोधान के पश्चात् वे १०९ में प्रतिष्ठित हुए। आत्म-अस्तित्व बोध से आत्मारूपी पुरुषोत्तम को ज्ञात कर लेने पर अद्वैतयोग संपूर्ण होता है एवं योगीश्वर बनकर योगी अमरत्व अर्जन करते है। तब योगीसत्ता में सीमाबद्ध कर्म असीम में रूपान्तरित होकर योगीसत्ता में अखंड का आभास जागृत होता है। तब शुद्ध बोध का बोधोदय होता है। इस विशुद्ध बोध का अर्थ 'केवल एक महासत्ता का आभास चैतन्य प्रकट' समझना होगा। छोटे-छोटे बच्चे जब लुका-छुपी का खेल खेलते है – गुप्त एवं अज्ञात स्थान से एक बच्चा जब 'टू' की आवाज करता है, तब उस शब्द के संकेत के आधार पर सुनकर दूसरा बच्चा उसे खोज लेता है। यह अन्वेषण करना ही है ज्ञान या बोधि। बोध नादरूपी महानंद ब्रह्मानंद शब्द ब्रह्मरूप में १०८ में

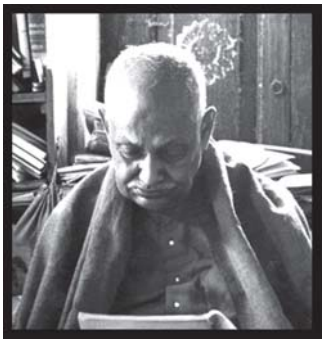

गुरु स्वरूप में प्रकट होता है। योगी अभाव से आकर स्वभाव में अवस्थित होता है। १०९ में प्रवेश होते ही योगी सत्ता के अनंत का अंत होकर एक के भीतर ही अनंत का समावेश होता है एवं योगी नवम-भूमि पर आरोहण कर 'परम-शिव' अवस्था की प्राप्ति करता है। परम-शिव की काया शुद्ध सत्त्वमय कारण-ज्योति द्वारा निर्मित ज्योतिर्मय काया। इस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात् सद्गुरुरूपी परमशिव द्वारा निर्वाचित स्थूल देहयुक्त 'आधा' के भीतर से आविर्भूत सत्त्वोर्जित विशुद्ध-देह में जगत् का कल्याण साधित करने में सक्षम होते है। विशुद्धानंद देव अपने स्थूलदेह त्याग के पश्चात् इसी 'परम-शिव' अवस्था में उपनीत हुए थे। जगत् के हितार्थ कर्म संपादन करने हेतु १०८ के ज्ञानगंज के सद्गुरुमंडल ने उन्हें स्थिति प्रदान की थी। १०९ की उपलब्धि के पश्चात् योगी स्थूल-सत्ता में दिव्य को धारण करने में सक्षम हो पाते हैं। तब पराभक्ति-योग से योगीश्वर रूप में सद्गुरु आत्म-कल्याण के माध्यम से जगत् कल्याण स्वतंत्र रूप में अकल्पनीय रूप से संगठित करने में सक्षम होते हैं। यह जो देहांत के पश्चात् १०८ से १०९ में उपनीत होना है यह भी है कृपायुक्त योग, नहीं तो कृपाशून्य योग में १०८ में जिस योगी का देहत्याग होता है उसके पक्ष में लौटकर आना संभव नहीं होता। क्योंकि वे हिरण्यगर्भ में अणुसम लिंगदेह में आत्म समाविष्ट होकर महाकारण चेतना में उपनीत होने की तपस्या में निमग्न हो जाते हैं। *..क्रमश:*

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

अभी तुम जो जाग्रत, स्वप्न या सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हो, उसी विषय पर विवेचना करूँगा। जाग्रत अवस्था में तुम्हारा उत्तमरूपी ज्ञान रहता है। तब तुम वाह्य समस्त पदार्थों को जान सकते हो, तब तुम्हारी समस्त इन्द्रियाँ सक्रिय रहने के कारण सभी वाह्यवस्तुओं को इन्द्रियद्वार द्वारा ग्रहण करती हैं। तुम्हारे स्वप्नावस्था में इन्द्रियों की वैसी सक्रियता नहीं रहती, वे सब अर्द्धलुप्तावस्था में रहती हैं। स्वप्न में जिन सब विषयों को देखते हो, निद्राभंग होने पर वे सब काल्पनिक लगते हैं। स्वप्न के विषय मिथ्या होते हुए भी हर एक स्वप्न के अलग-अलग फल हैं, वह नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णित हैं। अभी सुषुप्ति अवस्था को समझो। उस समय देह, मन, इन्द्रियादि संबंध में तुम्हारा कोई बोध नहीं रहता। यहाँ तक कि तुम्हारा अस्तित्व भी है इसका भी कोई बोध नहीं रहता। सुषुप्ति भंग होने के पश्चात् तुम्हारी स्मृति रहती है कि तुम सुख का अनुभव कर रहे थे। यदि सुषुप्ति काल में तुम्हारे सुख की प्रत्यक्षानुभूति नहीं रहती तब फिर निद्राभंग के पश्चात् सुख की स्मृति कैसे रहती है? जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है उसकी स्मृति भी नहीं रहती। प्रत्यक्षरूप में जो कुछ पूर्व में अनुभव किये हो उसी का ही बाद में स्मरण होता है। सुषुप्तिकाल में जीव बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथ हृदयस्थित ब्रह्म में लीन रहता है, इसीलिए उस समय चेतना प्रदीप्त भाव में नहीं रहती, बल्कि क्षीण भाव में रहती है। अभी देखों ये तीन अवस्थाएँ परस्पर विरोधी हैं। परन्तु तुम समझते हो कि तुम एक होते हुए भी तुम्हारी ये तीन अवस्थाएँ हैं। इन सभी अवस्थाओं की कोई भी अवस्था तुम नहीं हो क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं। तुम जाग्रत अवस्था-युक्त होते हुए स्वप्नावस्था-युक्त नहीं हो सकते। ऐसे किसी एक अवस्था में रहकर तुम दूसरी अवस्था-युक्त नहीं हो सकते हो। एक अवस्था का परित्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करते हो। तुम जब एक वेश धारण करते हो, बाद में उस वेश का परित्याग कर अन्य वेश धारण करते हो। तुम्हारे सारे वेश स्वतंत्र है, इन सभी वेशों में तुम वही एक हो। उस जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों में कोई भी तुम्हारी अवस्था नहीं है। उन सभी अवस्थाओं में तुम्हीं एक हो। तुम्हारे स्वरूप का रूपांतर नहीं होता। जो तुम ने जाग्रत अवस्था का अनुभव किया था, वही तुमने ही स्वप्नावस्था का अनुभव किया एवं उसी तुमने ही सुषुप्ति अवस्था का अनुभव किया। इन सभी अवस्थाओं के ज्ञाता, अनुभवकर्ता तुम ही हो। जड़ अचेतना बुद्धि कभी भी ज्ञाता नहीं हो सकती। चैतन्य ही ज्ञाता हो सकता है। तुम ज्ञाता हो इसीलिए चैतन्य हो। तुम्हारा अवस्थांतर घटित नहीं होता। तुम सदा ही बुद्धि के द्रष्टा होकर एकरूप में अवस्थित हो।

अविद्यायुक्त बुद्धि के साथ तुम्हारा अनादि संबंध होने से बुद्धि परिवर्तन को तुम स्वयं के परिवर्तन के रूप में परिकल्पना कर रहे हो। तुम बुद्धि, इन्द्रिय और स्थूलदेह से युक्त होकर स्थूलदेह को 'मैं' या 'मेरा' कहते हो। कभी त्रिगुणात्मिका अचेतन बुद्धि को ही 'मैं' कहते हो। परन्तु तुम उन सबों के अतीत-चैतन्य हो। साधन द्वारा तुम्हारे आत्म-तत्त्वज्ञान के उदय होने पर तुम समझ जाओगे कि तुम त्रिगुणातीत, नित्य, निर्लेप, अजर, अमर, सर्वव्यापी, चैतन्यस्वरूप। ब्रह्म चैतन्य सर्वदा ही एक समान हैं। उनका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। फिर भी जीव देह के भीतर एवं जड़ जगत् में वे प्रविष्ट एवं परिव्याप्त होने के कारण नाना रूप, विभिन्न भाव उनके ऊपर आरोपित हुए हैं। उनके कई नाम रूप संज्ञा आदि शास्त्रों में वर्णित हैं। यथा – पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, आत्मा, परमात्मा, देव, देवता, ईश्वर, परमेश्वर, वसुदेव, नारायण, विष्णु, महाविष्णु, राम, कृष्ण, शिव, परशिव, परमशिव, व्योम, आकाश, प्राण, महाकाश, काली गणेश, दुर्गा, जगद्धात्री, काल, महाकाल, भूमा, हार्द इत्यादि। तीनों लिंगो में उनका नाम व्यवहृत होता

है। उसमें कोई लिंगभेद नहीं है। उनका स्वरूपतः रूप, मुर्ति, आकार इन्द्रियादि कुछ भी नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने वेदान्त-दर्शन के सूत्र द्वारा कहा है। परन्तु वे रूपविहीन होने पर भी विश्वरूप, मुर्तिहीन होने पर भी अनन्त मुर्ति। श्रुति में कथित है, ''पश्यत्य चक्षुः शृणेत्ये कर्णः''। चक्षु न होने पर भी वे देखते है, कर्ण न रहने पर भी वे सुनते है। वे अनन्त, उनकी शक्ति, महिमा विभूतियाँ भी अनन्त हैं। वे अमूर्त होने पर भी जब जो मुर्ति धारण करने की इच्छा करते है, उसे ही धारण करते हैं एवं जब इच्छा होती है उसका परित्याग कर देते है। जो असंभव है वह भी उनके लिए संभव है। वे निर्दोष, परम करुणावान, निर्दयता शून्य एवं पक्षपात रहित हैं। वे सगुण होते हुए भी निर्गुण, निर्गुण होते हुए भी सगुण है। वे सर्वज्ञ, अंतर्यामी एवं सर्वशक्तिमान हैं। ये विश्व के नियंता, विश्वेश्वर एवं जीव देह के भीतर अवस्थित होकर इसे अनुशासित करते हैं। वे स्वयंप्रकाश। उनके ही प्रकाश से सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत एवं समस्त जगत् उद्भासित है। वे किसी अन्य के द्वारा प्रकाशवान नहीं है। जो कुछ देखते हो या जानते हो वे समस्त ही उस के प्रकाश है। उनके अंतर्गत उनके अलावा कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए श्रुति ने उन्हें 'एकमेवाद्वितीयम्' कहा है एवं 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि कहा है। वे जीवगणों के कर्मफलदाता एवं उनके उद्धारकर्ता हैं। जीवगण भक्तियोग द्वारा उनकी आराधना कर उनकी कृपा से मुक्तिरूपी परमपद को प्राप्त करते हैं। वे शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत् को धारण एवं पोषण करते है। नहीं तो क्षणमात्र में यह सब विशृंखल एवं विनष्ट हो जाएगा। ''तस्य प्रशासनात् गार्गी, चन्द्र सूर्यो विधृतौ, अंतः प्रविष्टः शान्ता जनानां'' यही श्रुति की उक्ति है। वे सबों के शासनकर्ता। इन्द्र, यम, वायु, वरुण, रुद्र इत्यादि देवतागण उनके शासनाधीन रहकर उनके भय से डरकर निज-निज कार्य में प्रवृत्त हैं। वे इस समस्त विश्व के एकमात्र अधिपति हैं। उनकी महिमा का संपूर्णरूपेण वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं हैं। वेद भी असमर्थ है।

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भगवत् कथा

भगवान विष्णु और महर्षि मौद्गल्य

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

महान ऋषि मुद्गल के पुत्र 'मौद्गल्य' अति सदाचार परायण थे। वे प्रतिदिन गंगा-स्नान के पश्चात् गंगा-तट पर ही यथाविधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते। विष्णु मौद्गल्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके समीप आकर, उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात् दिनभर उनके साथ धर्म-संबंधी आध्यात्मिक चर्चा करते। संध्या होने पर मौद्गल्य गृह में प्रत्यागमन कर विष्णु के साथ उनका जो भी कथोपकथन हुआ वह सब विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी जाबाला से वर्णन करते। एकदिन जाबाला ने मौद्गल्य से कहा –''जिस विष्णु के स्मरणमात्र से ही मानव के सब दुःख दूर होते हैं। उस विष्णु के साथ तुम्हारी प्रतिदिन मुलाकात होती है, तथापि तुम्हारी निर्धनता दूर नहीं हो रही है?'' पत्नी की यह बात सुनकर तब मौद्गल्य ने दूसरे दिन विष्णु से मिलने पर उनसे उपरोक्त बातें पूछी। विष्णु ने कहा –''प्राणिगण स्वकृत कर्मों का ही फल भोगते हैं। अन्य कोई उनका हिताहित नहीं कर सकता। सभी कर्मों में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। तुम मेरा स्मरण कर, याचक को जो कुछ भी दान करोगे उसी से ही तुम्हारी मुक्ति होगी।'' मौद्गल्य ने कहा –''मेरे पास देने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि मेरी काया और मेरा मन समस्त ही आपको समर्पित कर चुका हूँ।'' मौद्गल्य की बातें सुनकर विष्णु ने गरुड़ से कुछ चावल के टूकड़े लाने को कहा। गरुड़ द्वारा उसे लाने पर तब मौद्गल्य ने उन चावल के टूकड़ों को विष्णु के हाथों में समर्पित कर दिया। उसी समय से विष्णु के प्रसाद से मौद्गल्य की समस्त दरिद्रता दूर हो गयी।

महर्षि मौद्गल्य को नृपति शतद्युम्न ने विविध प्रकार के सामग्रियों से परिपूर्ण एक हिरण्यमय अट्टालिका दान स्वरूप प्रदान किया। उसी पुण्यफल से राजा शतद्युम्न को स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

मौद्गल्य ऋषि महाराज जनमेजय के सर्पसत्र (यज्ञ) के एक विशेष सदस्य थे। ये महाभारत के समय भीष्म की शरशय्या के पास भी उपस्थित थे।

(सहायक ग्रन्थ : ब्रह्मपुराण एवं महाभारत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ५२: प्रकृत आनंद क्या है? आनंद का उत्स कहाँ है? आनंद प्राप्त करने हेतु क्या करणीय है?

उत्तर : 'आनंद' है आत्मबोध की शुद्ध अभिव्यक्ति। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए योग का उत्स कहाँ है इसकी उपलब्धि हेतु चेष्टा करो। प्रयास ही साधना है। योग प्राप्त होता है आत्मा में या आत्मचैतन्य में जहाँ विराट् का संधान प्राप्त कर अनंतबोध के आस्वादन से सत्ता आनंद से आत्महारा हो जाती है।

समुद्र में ज्वार-भाटा है। समुद्र में जब भाटा आरंभ होता है तब समस्त नदियों का जल सागर की तरफ चलने लगता है। अंत में सागर में जाकर मिल जाता है या विश्राम प्राप्त कर अवस्थित होता है। निर्मल हृदय में जब भगवान हेतु आकर्षण उत्पन्न होता है तभी भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान करते-करते उनके लिए उनके ही संस्पर्श हेतु दौड़ कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जितना ही उनकी तरफ अग्रसर हुआ जाता है, उतना ही उनके आकर्षण के अनुभव का संकेत मिलता है। तब साधक यह बोध करना आरंभ करता है कि श्रीभगवान मानों साधक का विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भक्त साधक नहीं होने पर भगवान को भी नहीं सुहाता। तब श्रीराधिका के सदृश सब धैर्य का बाँध टूट जाता है एवं भक्त साधक-योगी तब भगवत् सत्ता का संस्पर्श प्राप्त कर अपनी आत्मसत्ता के अस्तित्व को धन्य मानते हैं। श्रीभगवान ही प्रकृत आनंद का उत्स है। उन्हें जानकर, सगुण या निर्गुण उनके साथ सटीक योग रख पाने पर आत्मयोग में उपनीत योगी-साधक यह उपलब्धि कर पाते है कि सत्ता के भीतर से कितनी शक्ति, कितनी शांति, कितना आनंद, परमानंद सब प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रहा है। यही है परमेश्वर की परम आनंद विभूति।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आश्रम समाचार

१५ अप्रैल –बंगाब्द १४२६ की सूचना के शुभसंध्या पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन के अभिलाषी अनेक भक्तों का समागम हुआ। सायंकाल में सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने साधना के अमूल्य विषय पर प्रकाश डाला। इसदिन बंगला पुस्तक तपोसिद्धा और हिरण्यगर्भ के पूर्ववर्त्ती संख्या प्रकाशित हुए। तत्पश्चात् श्रीश्रीमाँ के सुमधुर संगीत से नववर्ष का इह सन्ध्या उपस्थितजनों के लिए आशीर्वादधन्य हो उठा।

१८ मई – बुद्ध पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर श्रीश्रीबाबाजी महाराज का श्रीविग्रह प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। संध्या में आश्रम में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग साधन सम्बन्धी अत्यंत शिक्षणीय कुछ वक्तव्य पेश किए। इसदिन हिन्दी पुस्तक श्रीश्रीमाँ प्रकाशित हुए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का परिचालन गुरुभ्राता डा: श्रीवरुण दत्त ने किया।

१६ जून –श्रीश्रीजगन्नाथ देव की स्नानयात्रा के दिन श्रीश्रीमाँ की आविर्भाव तिथि मनायी गई। दोपहर में भक्तवृन्दों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में आश्रम मन्दिर में भजनों का मनोहर अनुष्ठान हुआ। अंत में श्रीमती लावणी लाहिड़ी ने कुछ अति सुंदर संगीत का परिवेशन किया।

३० जून – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के ३१वें पर्व पर 'कठोपनिषद् प्रसंग' की चर्चा हुई। कठोपनिषद् प्रसंग पर अपना तात्त्विक वक्तव्य प्रस्तुत किया डा: वरुण दत्त ने।

आगामी अनुष्ठान सूची

श्रीश्रीमाँ का प्रवचन – १८ आगस्त,रविवार,सुबह ११ बजे

जन्माष्टमी – २४ आगस्त, शनिवार, संध्यानुष्ठान ७ बजे

अध्यात्मिक सभा – २२ सितम्बर, रविवार, संध्या ७ बजे

महालया – २८ सितम्बर, शनिवार

दुर्गा नवरात्रि – २९ सितम्बर - ८ अक्टूबर

३ अक्टूबर (पंचमी):– संध्यानुष्ठान

५ अक्टूबर (सप्तमी):– संध्यानुष्ठान

६ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।

७ अक्टूबर (नवमी):– श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद

कोजागरी पूर्णिमा (लक्ष्मीपूजा):– १३ अक्टूबर, रविवार

Sri Sukdev – Veda Vyasa's Divine Son

Sri Sukdev is a unique divine avatar saint. Sri Veda Vyasa was gifted this divine child through the blessings of Lord Shiva after a prolonged, passionate penance of deep devotion. Lord Shiva blessed him saying, "Dwaipayan, you will beget a son who will be ever engrossed in Brahman with all his mind, life and intellect. His fame will spread over the three worlds." Pleased at receiving this forthcoming boon, Vyasa returned to his Ashram to perform the Agni-hotra yagna. As he was churning logs of arani (fire-wood) to light the sacrificial fire, a celestial apsara named Ghritachi appeared. Seeing her, Vyasa's chitta (subtle mind) fluttered and he began to rub the logs hard to regain control of himself. Ghritachi, afraid that the sage would curse her in anger, tried to contain the situation by taking the form of a parrot (Suka-pakshini). However, the sage was unable to overcome his emotion of lust and the ojas (virya) fell on the arani. As he rubbed the arani harder, instead of fire, a luminous child emerged. Vyasa realized that this was a divine way through which Lord Shiva gifted him his son. Thus was born Sukdev – the illustrious son of Veda Vyasa, as powerful in spiritual prowess as his legendary father. Suka also means fire as the outcome of ojas shakti.

Sri Sri Sukdev

The young prodigy was provided with precious gifts from the divine forces. Devi Ganga appeared, bathed and cleansed him; the Gods blessed him with a divine set of danda (staff), kamandalu (water-pot) and krishnajina (deerskin), worthy for a brahmacharin. In the presence of all the heavenly beings, his upanayana (sacred thread ceremony) was performed. As he became absorbed in deep meditation, the knowledge of the Vedas and Holy Scriptures automatically sprouted within him. In order to keep up with the order of society which required a Guru for such a stage, he requested Lord Brihaspati to be his Guru and offered him dakshina for receiving teachings. He was tutored by his father in the Yoga Shastras and Kapil Darshan. Soon, through his constant spiritual practice, this little brahmacharin child was respected by one and all for his grasp of knowledge and yoga. As he progressed, he realized the transient nature of the world and the urge to attain moksha (liberation) germinated. His father advised him to take tutelage under King Janaka, the Perfected-Living-Liberated Emperor-Sage of the times.

The story of Sukdev's studentship under Rajarshi Janaka is famous and very illuminating for a seeker of truth. Initially Sukdev was extremely disinclined to meet Janaka as he was not a Guru in the traditional Ashramic lifestyle. He was a king, living a worldly life. Sukdev did not have a good impression of such persons and could

not believe that he could be a moksha delivering personality. But his father advised him to go indicating that King Janaka was the best person to teach him. Ten times he went to the kingdom, but due to flow of unkind thoughts about the king engulfed in worldly duties of his empire, Sukdev returned without meeting his designated teacher. Then Sage Narada appeared before him and explained to him how every ill feeling about King Janaka was the cause of Sukdev losing his divine gifts one by one and that now he was almost left to becoming a person of ordinary abilities. At this point, Sukdev grasped the importance of throwing away his ego and went to the Palace of King Janaka. Before entering the King's sitting room, he left his staff, waterpot and sling-bag outside at the door. As he sat down and introduced himself, the king's guard came in and said that the army cantonment was on fire and requested for orders. The king told him that all should do their duty during this calamity and the rest is God's Will. Suka was bewildered as to how a king could be so unperturbed at such a situation. The discussion started. Within a few more minutes the guard came running in stating that most of the city was on fire and requested for directives. The king repeated the same, saying that all should do their required duties at such a situation and the rest is the Will of God. Sukdev became restless at such a king who seemed least bothered about an impending danger in his kingdom. He could not concentrate on the discussions. Soon after, the guard came back in a state of panic. The fire had entered the palace! The king repeated the old directive as he had done before. Sukdev could not take it any longer. He started to rush out. Janaka asked him where he was going. He replied that he was going to collect his belongings as the fire was already in the palace. King Janaka smiled and said, "How will you learn about liberation if you are so concerned about your meagre worldly possessions? Nothing has happened. I was just testing you."

Sukdev requested to be taught. Janaka indicated that he was still not ready and the previous incident indicated that he needed to concentrate amidst surrounding chaos. He needed to take another test. He was given a bowlful of oil and asked to travel through the busiest parts of the city and return. He would pass the test only if not a drop of oil fell. Sukdev went across the city, deep in concentration to avoid a spill and returned successfully. Pleased Janaka asked him, "What did you see in the city? What did you hear?" Sukdev replied, "Nothing". Janaka smiled. He asked for initiation from Janaka. The reply came, "Wait". Very disturbed Sukdev returned disappointed and again ill-feelings arose. His father advised him to go back and learn to be patient and humble. For the next twelve years, Sukdev stood outside the garbage dump of the king's palace, praying for initiation. Slowly all ill feelings, all negative thoughts went away and what was left was a yearning for knowledge of liberation. Even the garbage from Janaka's room falling on his head did not cause any flutter. After twelve years of such a penance, Janaka called him in and initiated him. The divine truth flourished in the ready-to-be-lit Sukdev. Janaka taught him about Brahman, Atma, Universal Consciousness, Creation, Bondage and Liberation. Every word uttered by Janaka led to high spiritual experience. Sukdev was now fully illuminated.

After self-realization, Sukdev moved into the realms of Bhakti sadhana and eventually became capable of entering Golak-dham and earning a place there. During Dwapara

Yuga, when Lord Krishna descended with his divine beings into Vrindavan, several Gods and sages became part of this leela on earth, taking up various roles including trees, animals, birds, insects and the like. Sri Sukdev was a favourite parrot of Sree Radhika. She would utter the name of the Lord, saying 'Krishna, Krishna', in Sree Radha's identical voice. One day, after Sree Radharani fed the parrot with pomegranate, milk and rice, it flew off to Nandagram where Sri Krishna was encircled with his friends. It then perched on a pomegranate tree and called out 'Krishna Krishna' sweetly in Sree Radha's voice. When a surprised Sri Krishna came to see the bird, it lamented, "O, what an unfortunate and sad creature am I. I have left my lady-mistress and come here." Hearing it, Sri Krishna took the parrot in his hands and began to caress it lovingly. At that moment, Lalita and Vishakha came to the spot and informed Sri Krishna that the bird belongs to their friend-mistress, Sree Radhika. But the bird refused to leave Sri Krishna's hands and go to the duo. Then these two ladies called Maa Yashoda for help. Mata Yashoda took the bird from Sri Krishna, gave it to the two principal friends of Sree Radha and took Sri Krishna inside the house. This parrot became the medium of communication between Radha and Krishna. When they prepared to leave this mortal world, the parrot desired to go along with them to Golak-dham. But both Radha and Krishna requested the parrot to stay back and spread the message of Bhagwat Leela to the world. They consoled the weeping Suka saying that there is no one better to tell this divine tale.

After Lord Krishna and Bhagwati Sree Radharani left the mortal world, the Suka parrot began to search around for places to hear about Bhagwat-Katha. Finally on reaching Mount Kailasa, he found Lord Shiva relating the divine tale of Radha-Krishna to Devi Parvati. Sukdev, as the suka parrot began to quietly listen to these wonderful tales and absorb them. It is said that one who listens to the complete Bhagwat Katha attains immortality. Suka was firm on achieving the goal. As Shiva continued to explain the deep intricate knowledge of Bhagwat, Parvati would reply in monosyllables of 'hnu, hnu' to indicate that she was grasping it. In between sleep engulfed Devi Parvati. However, in order to let Shiva continue and complete, Sukdev parroted the 'hnu hnu' in Parvati's style. After the complete Bhagwat's spiritual science was revealed, Lord Shiva looked up and found that Devi Parvati was asleep. Looking around, he noticed the parrot. Annoyed at having imparted such a deep secret to an unknown and probably unworthy candidate, Lord Shiva hurled his trishul (trident) to kill the bird. It fled in panic as the trishul followed it. The bird then entered into the Ashram of Sri Veda Vyasa. At that moment, his wife Devi Vatika (also known as Pinjala) was about to drink water. The bird entered the water in her hands as she gulped it in her mouth and moved to the womb. It remained in the womb for twelve long years (some say sixteen), mastering the scriptures while still inside. Devi Vatika started growing weak. Eventually, Sage Vyasa spoke to the entity in the womb, "Who are you in the womb? Why are you not coming out? Do you wish to kill my wife?" The child in the womb replied, "I cannot firmly decide who I am. I have travelled through all kinds of embodiments from creatures, birds and animals. Now I am in a human body. This is a great opportunity for me. I will not come out. I will practice yoga inside the womb and attain liberation

here." After much pleading, Sukdev emerged, born as a twelve year old child[1]. The young lad paid obeisance to his parents and immediately went off for tapasya. In this birth, he remained a travelling hermit. He learnt yoga, scriptures, puranas and other texts from his father, especially mastering the Mahabharata and Bhagwat Purana. Subsequently he was the main preacher of the Bhagwat Purana after his father with a large following. His teachings to King Parikshit at the impending onset of Kaliyuga form a large portion of our ancient Bhagwat Purana descriptions that have survived till date.

Sri Sri Vitthalnath

Sree Sree Maa gave us many more insights on the eternal life connections of this inseparable father-son rishi-pair – "Sukdev is a special tapasya-creation of Vyas-dev, almost his alter ego. Whenever Vyas-dev descended, he usually brought his son with him, especially in the leela manifestation births. When Vyas-dev appeared as the great Vallabhacharya during the times of Chaitanya Mahaprabhu, Sukdev was his second son, Vitthalnath, who spread the message of Pushtimarg far and wide. More recently when Vyas-dev appeared as Bhagwan Kishori Mohan during the times of Prabhu Jagatbandhu and Sri Ramakrishna-dev, Sukdev came to him as his son Rudra-dev, an illuminated soul from birth who always remained in a higher order spiritual state. He would vanish now and then and Bhagwan would frantically search for him in the bylanes of Kashi. Even at his last moments, Bhagwan ensured that Rudradev left with him. First Rudradev left his body and soon after Kishori Bhagwan went away, both in the same day, within a few hours. They are an eternal divine pair, one an almost alternate image of the other. I pay my deepest reverence to them both."

With a mischievous smile I remarked, "Your divine great-grandson and great-great-grandson?" The reply came with a delighted twinkle in her eyes, "You have become too naughty these days. They are spiritual giants by their own right."

[*Adapted from Sree Sree Maa's article*]

–her Blessed Child,

Prof. Partha Pratim Chakrabarti

1 During ancient times, rishis often took the same names in multiple births as their peers recognized them through their inner vision. Moreover, Vyas-dev and Sukdev almost always came together as father-son pair whenever they were born in various ages.

You should all be good and religious persons – Not a God fearing man but a God loving man. Speak the truth. Be just and honest to all. Treat all persons equally. Have faith in Lord Krishna and surrender yourself to him. Be charitable and never harm the hungry and the weak. Realize that service to men and animals is service to God. You should believe that Krishna is our God and never slacken your faith in him and then he will surely protect you. You should regard him as the be-all and end-all of your life. Your ultimate good lies in serving him, which should be done with all your heart, mind and soul. Trust in his protection. Remember him always in all thoughts, words and deeds.

–Sri Sri Vallabhacharya

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 11

The technique of restraining the mind – 2

The Mahatma continues: One who came to understand the magical, illusive and deceitful feature of the mind is immune to the erroneous influence of mind or maya shakti. A wise man with self-realisation understands the plurality and fakeness of mind and thus is relieved from the tyranny and injustice of the mind. A man, who doesn't know the reality of the mind, is overwhelmed by various sorrows created by the mind. The mind is restrained from creating problem to one who has delved deep into the depth of the mind. Hence understanding the reality of the mind or 'prakriti' or its ignorance is the controller of the 'nivritti' (desisting) or 'pravritti' (inclination) of creation of joy and sorrow. This mind or nature sets itself into sadhana and as soon as realisation dawns, the mind vanishes. It is mentioned in Sankhya darsana '*doshbodheopi noposarpanang pradhanasya kulbadhuvat*' - meaning 'when the true swabhava' or nature of prakriti is exposed to the purusha, then the purusha fathoms the reality of the mind in the form of transformation and the cause of suffering. As a result, 'prakriti' becomes ashamed and fails to dominate the interior of the purusha. My Son, the very feeling that whatever the mind performs through the body, I perform i.e. I am the physical body has been evoked by mind, which has been hammered repeatedly leading to a total loss of your actual reality which is Brahman or Atman. What more, it has led to total dissolution of your judgment that helps in understanding your true 'self' through purushakar or self-effort. Hence the more you analyse and understand the deranged follies of the mind i.e. joy and sorrow, desire and anger etc. are waves or oscillations in the river of the mind and ruin the mind, the more your mind will undergo tranquility and peace pervade you. Vedanta has also asserted, "Mind itself is the cause of bondage and liberation of mind. When human mind continuously ruminates in 'vishaya' or worldly matters, it becomes intoxicated in 'vishaya' and creates bondage. Similarly, the human mind, which finds fault in the 'vishaya' continuously, frees itself from the shackles of 'vishaya' and creates emancipation (from birth and death, joy or sorrow, etc.)." Hence the antahkarana (mind-stuff) which is free from 'vishaya' and desires undergoes liberation. Hence, people like you desirous of liberation, should always endeavour to keep the mind immune to desires. When the mind relinquishes all desires and becomes one with the object of meditation in the heart lotus, it becomes free from all resolves. It is in this desireless and unoscillating state that the mind fixes on the kutastha and achieves the beatitude of liberation.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

If you really want to judge the character of a man, look not at his great performances. Every fool may become a hero at one time or another. Watch a man do his most common actions; those are indeed the things which will tell you the real character of a great man. Great occasions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness, but he alone is the really great man whose character is great always, the same wherever he be.

–Swami Vivekananda

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(31)

Similarly, the Vedas have prescribed numerous procedural streams towards receiving *Brahma-vidya.* Although, different meditative procedures have been suggested according to distinctions in the preferences and contemplative capacities of individual seekers, the ultimate objective of all such *vidyas* (practices) is the attainment of the *Brahman*. Love and harmony among different spiritual communities should be maintained by comprehending that all forms of spiritual practices is eventually the meditative contemplation of the One and Absolute *Brahman*.

The *Gita*'s maxims express thus,

Aham hi sarva-yajnanam
bhokta cha prabhur-eva cha
Na tu mam-abhijananti
Tattwenatas-cyavanti te.

Meaning: The *Paramatma* is the enjoyer and the ultimate object of sacrifice. Failure in the recognition of this reality leads to disgrace and deviation from the path of Truth.

The *Mahimna-stava* says,

Riju-kutila nana-patha jushang-
nrinameko-gamyastwamasi
payasam-arnava iva.

Meaning: Just as the rivers traversing different paths ultimately enters the ocean, seekers following varied paths to realization, whether straight and twisted (depending on temperament and preference), ultimately reach and converge in the *Paramatma* alone.

Although this verse is dedicated to Lord Shiva, here, the word-fragment *twang* (you) refers to the Universal Consciousness *Brahman*. It is impossible for this word-fragment *twang* to have petty sectarian implications. This is because, the *Paramatma* is ultimately the one and only goal and object of contemplation for all spiritual aspirants. This is no harm even when this One Universal God is contemplated upon through distinct names and forms. Irrespective of whichever deity is worshipped, it essentially converges down to the revered contemplation of the Divine Universal Consciousness, when such worship is conducted by ascribing *Brahmic* qualifications on to the deity. Therefore, this superficially perceived distinction between the contemplation of *Brahman* and the worship any other deity, do not exist in reality. This generic phenomenon is observed everywhere and is similar to how the worship of Lord *Vishnu* gets accomplished when qualifications associated with Lord Vishnu are attributed to the '*Shalgrama*' stone. As the spiritual aspirant progresses into higher realms of meditative contemplation, the seeker begins to realize the essential oneness among the multitude of distinctive forms—the perception of differences in forms and qualities only exists at the lower stages and withers as the consciousness is refined, at higher levels.

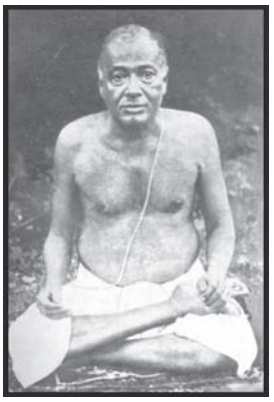

Within the divine invocation prayer (*mangalacharan*) at the commencement of his commentary on *Srimadbhagavat*, *Sridhar Swami* has written, "*Hari-harau ekatmanau*." This phrase has been used to indicate the essential oneness of the Lords

Hari and *Hara* in their *Atmic* manifestations. The more discriminatory your attitude, the more will you diverge away from *Brahmic* consciousness. All sects should get together and sing the glory of the name and divine qualities of Lord *Hari*. The *Srimadbhagavat* says,

"*Kalau tad-Hari kirtanat*"

This highlights the following idea – spiritual accomplishments that are attained only through immensely stern austerities and harsh penance in the other *yugas*, may be achieved only by praying and singing in praise of Lord *Hari*, in the *Kaliyuga*. Therefore everybody, irrespective of their sectarian differences, should unite sing the glory of Lord *Hari*. This will also have the effect of eradicating the animosity among different spiritual sects.

The lack of devotion and surrender on God is the primary cause of distress in the Indian landmass. However, such devotion and surrender on God is in the very innate nature of India, and hence, the key towards the end of distress and the return of happiness, lies in the revival of this devotion and surrender. The entire world is essentially one and same in its soul, spirit and flow of existence. Peace may be established on this earth if the people of this world realize this fundamental philosophy and accordingly progress by adopting suitable ethics and measures. May the benevolent grace of God bring peace by ceasing wars and murders, oppression of the weak by the powerful and baseless wasteful expenditure.

May the emperor enact as a representative of God, ruling and protecting citizens as his own children. Likewise, may the citizens treat the emperor as their own parent and bear as favorable attitude towards him. May warfare and conflicts be eradicated; may peace be established everywhere on earth. May the Vedic proclamation, "*Ekamevadwitiyam*" (there exists the One and only One Almighty, without a second) be spread all over the world.

May all forms of quarrel, disputes, conflicts, battles, murders and oppression be eradicated. May "*Ekamevadwitiyam*", the very essence of the Vedas, be echoed everywhere. May the world lift its face towards enlightenment and attain the Spiritual vision. May the world become a collection of peacefully coexisting states. May the people realize the essential spiritual unity among themselves and progress together in the path of liberation.

...to be continued

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

However powerful be the attraction for the Pleasant, there is in man's nature a latent attraction for the Good. So, man has to control his quest for desires and wealth by the rule of Dharma (the higher law of life). In the Upanishads, we find mention of many trunks or pillars of Dharma such as Brahmacharya (Celibacy, Chastity), Adhyayana (Study), Tapas (Askesis), Yagna (Sacrifice) and Dana (Charity). By the practice of such disciplines, discrimination and self-awareness increases, which differentiates him from the animal. When self-awareness is strong, the witness consciousness, the spirit of detachment grows in the depths of the inner being, which makes a man, a voyager or a pilgrim of Immortality, a Seeker of Liberation. Momentum for action then changes direction towards quietude or introversion. Aspiration for True Knowledge arises in the Heart of a novice – one who knows not (Nachiketa). **–Sri Anirvan**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(10)

Leaving Bhutnath babu's house, ancestral business, Sir Hebert Homewood and religious talks:

After initiation, the whole series of the incidents of his life cropped up in the memory of Manicklal. His inner consciousness always realised the indications of his worshipful gurudev. It seems that these were the results of the elevation at the vertex of his head akin to a shivalinga, which arose as a consequence of gurudev's divine touch. At gurudev's instruction, Manicklal asked humble permission from Bhutnathbabu for returning to his home. Bhutnathbabu became very dejected and aggrieved at this. The loving Bhutnathbabau humbly requested Manicklal to withdraw the proposal and moreover he also suggested to dedicate half of his movable property to him. But Manicklal was firm in his resolve. Bhutnathbabu, being as aspirant, came to feel that his days are numbered, hence said to Manicklal, "I will die if you leave." Manicklal was put to a dilemma between the earnest request of a spiritual seeker on one side and the inner order of his guru on the other, thus he was puzzled about his duty. But truth is very harsh and merciless. As Girish Ghosh puts it, 'the stern Hari'. The activities of one who is surrendered to Hari follows His activity. At last, Manicklal left Bhutnathbabu's house with a broken heart and returned to his home at Chinsurah. The intensely distressed Bhutnathbabu left his mortal coil soon at this separation.

Manicklal came back to his ancestral home at Chinsurah. He was principally gripped by the thought that he had to fetch some job to meet his domestic expenses as he was the eldest son of his mother. Specially as his father Shyamacharan was indifferent to his family and devoted majority of his time in the company of saints, the family became financially crippled. The other brothers were all minor then. While his stay at Kanu junction, Manicklal became intimately acquainted with an anglo-Indian station master Mr. Turner. Mr. Turner was childless and he used to be deeply infatuated by the spiritual mind of Manicklal, whom he looked as his son. In those days, there was a deficiency of conveyance for the transportation of materials in the Dhanbad Jharia area. Mr. Turner was keen in starting a transportation business there along with Manicklal. But he had four more years for his retirement and thus delay in materialisation of his wish. So Manicklal temporarily joined as a booking clerk at Tarakeswar railway station at the recommendation of Mr. Turner. But he had to discontinue this work within a few days. Satish Pandey (Giri), who was a group D staff in the railway in his early life was the chief mohant at Tarakeswar temple at that time. The pilgrims who went to see the Tarakeswar idol were very much terrorised by the the hateful attitude and inhuman behaviour of the mahant. On receiving orders from gurudev to leave that place, Manicklal resigned the job and came to Kolkata.

At Kolkata, Manicklal took the resolve of engaging himself in his grandfather's business. But Manicklal didn't have the knowledge of a jeweller, nor the financial ability to carry on the business of gems and precious stones. Moreover, Manicklal also didn't have the acquaintance with that strata of people, like raja, maharaja and the rich who had maximum interest in the type of business materials. Finding no other option, he took refuge with Raja Badridas a friend of his grandfather and begged for his advice and help to start the business of his grandfather again. Raja Badridas convinced Manicklal about his advent to Kolkata for search of prosperity, his acquaintance with Kalicharan, the grandfather of Manicklal, Kalicharan's slow establishment in business and his familiarity with the raja, maharaja and the rich people of his country and the distinguished customers of abroad. Raja Badridas also expressed his earnest disgust and lamentation over Kalicharan's sudden disappearance and the consequent miserable failure of his well established business. On the appeal of Manicklal, he shared the address of few customers of his grandfather's business to him and asked him to carry on the business on commission basis by giving him precious gems and jewellery from his own stock. He also advised Manicklal to adopt great caution and alertness in the business of precious stones and gems. With immense gratitude to Raja Badridas, Manicklal took a room with mud floor in Benetola area of Kolkata in rent of monthly twelve annas in order to participate in the business as encouraged by Badridas. Manicklal had to engage himself in procuring money to fetch his domestic expenses no doubt, but in the midst of activities and during free time he never refrained from the thoughts of his worshipful guruji.

Manicklal started visiting the houses and palaces of the raja-maharajas with the diamond and jewels received from Badridas, from whom he also received their addresses. In order that the queens and the princess, residing in the secluded inner compartments of the palaces, may choose these precious jewels and be-jewelled ornaments, Manicklal had to handover the same to the dewans or responsible officials on the basis of verbal commitments. Manicklal had to pass sleepless nights for fear of defalcation. Such incidents, however, did not happen due to the grace of the guru but a small portion of the ornaments were purchased and thus the amount of commission that he received was too less which was absolutely insufficient to cater to his domestic needs. Manicklal's father, who was extremely fond of the company of the saints, occasionally returned to his house from the ashrams and sometime even stayed with his son at night at the house at Benatolla at opportune moments. He noticed that this house at Benatolla was possessed by the spirits. Very often there were knocks at the door but when the door was opened nobody would be visible. As the door was closed, knocking started again. It is heard that the inauspicious influence of the spirits on Manicklal's room was exonerated with the help of mantra chanting by his father. Manicklal, however was unaware of these things as he was always absorbed in divine feelings and thoughts.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(64)

I (Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur, Howrah) was studying Cost Accountancy then. I was posted at Anantapur, Howrah. That branch was located on the bank of the river Rupnarayan, near Siddheswari Cotton mills. I had ICWA (intermediate) exams after one month, hence I applied for a leave of ten days in the office. Then I went to Gurudev (Sri Sri Saroj Baba) for his blessing. Gurudev said, "Pradip, get your leave cancelled. You will be unsuccessful in this exam." As the arrangement of the leave was finalised, I didn't apply for its cancellation. As usual, I went with my preparation. That was the introductory year for the Computer System in the exams in which I had no idea. Though the instructors showed the process of computer use in the exam hall, I became nervous and though I fared well in the exams, I failed due to the negative marking.

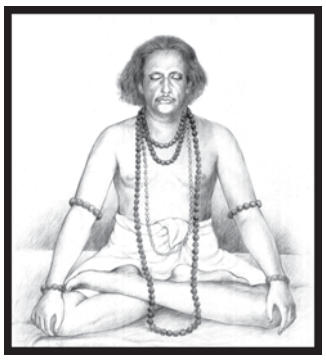

(65)

The headmaster of the Higher secondary school where I (Sri Pradip Chattopadhyay) read was a very responsible and strict man. He used to stay near our Guru maharajji's (Sri Sri Saroj Baba) residence and was his friend. He was called by the name Tulada. The elder brother of Tulada was also a teacher in the same school. I was talking of the time when the elder brother of Tulada had already retired from his service and was suffering much from health problem. Everybody in his house were worried. One day Gurudev said, "Pradip, Tula's elder brother will leave this world within a day or two." Truly, the elder brother of Tulada expired within two days. After a few days, when this was said to master mahashay, he said, "Pradip, your Gurudev could spell the time of his departure correctly which the doctors couldn't. This is possible only for a rishi who has transcended time."

(66)

After a few months of coming to Gurudev's (Sri Saroj Baba) house, my mother once invited Gurudev to place his lotus feet in our house. Gurudev said, "Ma, I will visit your house on next sunday at 8 am." My mother asked how could he visit our house as he was not familiar with the location of our house. Baba said, "Maa, I will definitely find it out." We were greatly elated at this news. On the specified day, my mother decorated the walking path of Baba with flowers and sandal. Time rolled on, it was almost 9 am but Baba didn't come and my mother became restless. At 9 am, four guru-brothers came to our house from Baba's house on cycle, they were Bapida, Ashimda, Mithun and Dr Anjan. My mother asked them, "When will he come." They said, "Baba will not come, he has sent us and said us that Pradip's house is east facing and the big front door is green in colour. As you enter the door, you will find the path is punctuated by sandal marks and decorated by white and pink flowers. After some distance, you can see that the decorated path turns to the north, then to the east and finally leads inside a room. Inside you will find asana for puja facing east and an illuminated lamp on lamp-stand. There is a bell metal plate with a variety of flowers." Though my guru-brothers said so many

things, nothing seem to have entered into the ears of my mother. Initially my mother became angry and then she started crying. My gurubrothers started explaining her, "Ma, don't be overwhelmed, Baba is sitting on the asana in his astral form." Ma said, "These are all your useless talks, I don't believe it."

Now regarding Baba, he used to often remain in divine ecstasy as we have seen in Lord Chaitanya Mahaprabhu. Baba was absorbed in a state of ecstatic bliss as he always visualised the divine play of Adya mahashakti in this world. One day, Baba came out of his house without sleepers and he wished go to Bablada's house. Baba's house is in Baksara and Bablada stayed a little far away at Ramrajatala. The condition of the road was very bad, the surface was broken giving rise to numerous potholes on it. Baba easily walked on it. When asked Baba replied, "Maa Adyashakti Durga herself put a soft slip sheet on the road. I walked happily on it and came here."

I sometimes feel that I do not have the basic intellect or knowledge even like a boy of class IV or class V but still I receive unending grace of Guru Maharaj and Sree Sree Maa.

(67)

These are the quotes of Sri Sri Saroj Baba, written by an advanced kriyaban, who doesn't want to disclose his name.

1) Once during kriya initiation, there was deficient flowers and garland, for which Sri Sri Baba said, "What is the use of physical garland, bloom the flowers inside you and then offer it to the Guru.
2) Kriya is an all time protective armour.
3) If you are supposed to traverse a distance of 300 kms, then you have to cross the distance alone. I will not do anything for you. But I will be beside you so that you don't understand how you clasped your friend's hand and crossed the distance.
4) Bloom your flowers and the bees will be attracted to you, you need not go anywhere.
5) The Atma-narayan within an individual forgives all his vices but doesn't forgive egotism that stems from the vices of the sense-organs.
6) However high the kite may fly, the thread and the reel are in my hand, the colour of the kite can be changed at will.
7) One who has tasted the ghee (clarified butter) of my shop, has to come to my shop only.
8) Although my Guru visits a wine-shop, even then my Guru is Nityananda Roy.
9) I need to have beef daily (not the physical beef). The significance of the statement needs to be studied from a Guru, as it is a secret knowledge possessed by a spiritual guide.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Lord Rama gave Hanuman a quizzical look and said, "What are you, a monkey or a man?" Hanuman bowed his head reverently, folded his hands and said, "When I do not know who I am, I serve You and when I do know who I am, You and I are One.

Faith is that which dispels desire, Devotion is that which generates knowledge. And Vedas say that knowledge is that which fashions freedom.

I call him Rama. You can call him by any other name but have faith in him, surrender all worldly desires and passions to his will and without effort, become disciplined and principled. **–Goswami Sri Sri Tulsidas**

Unmesh

[Soul's Blooming - Part VI]

Sree Sree Maa Sharbani

Makar Sankranti (14/01/09)

Discourse by Sree Sree Maa...

Self-Realized Mahatmas look upon all beings with an impartial eye. However, what general people understand by impartiality is not what the realized Mahatmas mean. Mahatmas look at all living beings in the universe as the expression of the same supreme consciousness; hence they are termed as having an equanimous view, referred to as "Samadrishti' – literally meaning with the seeing equally everywhere – of the omnipresently resident conscious soul. In a self realized state one feels the expression of the same supreme entity in everything; but in worldly affairs and interactions between human beings, living entities are attached to their egos leading to variability of personality and nature. Such human beings are unable to perform their karma with an impartial view or with equanimity. Karma is driven by the individual's inner traits; hence the individual who possess the respective expertise in that particular field can perform the required activity. Was it possible for any other person to replicate the karma done by Swami Vivekananda? Why did Thakur Sri Ramakrishna select Naren amongst all his disciples? Thakur selected Naren as the 'leader' of his sanyasi sons, as Naren was best suited for the necessary karma. Again, in the absence of Naren, it would not have happened without 'Sree Maa'. Therefore, 'Sree Maa' later accepted the leadership silently but remained in the background. However the Almighty is "all merciful" keeping an equal eye for the genuine disciple.

A being's nature is governed by the variable expressions of the three Gunas, namely Satwa, Rajas and Tamas. The individual's consciousness is expressed based on the respective nature of each being. For this reason, the development of the spiritual seed sowed by the Sadguru is not same in every individual. It is true that the Sadguru transfers equal energy in all disciples whilst sowing the seed of inner consciousness. However, due to variability within each individual adhara (vessel of the self), there is heterogeneity in expression and flowering of the seed of self-consciousness sowed by the Sadguru. During sadhana one achieves equilibrium of the three Gunas, but when does this happen? Once the Yogi achieves cessation (Nivritti) of all instincts (Pravritti) emanating from desire, then owing to equilibrium of all three Gunas, the stillness enables the individual to express the latent underlying divine qualities (divya samskara). That means equilibrium of three Gunas is achieved when there is cessation (Nivritti) of thought-action instincts (Pravitti). It is then that the topics related to the all-pervading consciousness spontaneously expresses itself from

within the Sadhaka. At this stage all individual Sadhakas become aware of the equanimous nature of the Sadguru, perceives and experiences the compassion bestowed by the Sadguru.

...to be continued

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

The description of Brahman: "Not this, not this" (*Neti, Neti*); for there is no other and more appropriate description than this "Not this." *Now the designation of Brahman*: "The Truth of truth"; The vital breath is truth and It (Brahman) is the Truth of that.

—Brihadaranyaka Upanishad

News in Brief

15th April - On the occasion of the Bengali New Year, a lot of devotees visited the Ashram. Sree Sree Maa Sung a few enchanting bhajans which enthralled the devotees present. The Bengali book 'Taposiddha' and the previous issue of Hiranyagarbha was released.

18th May - On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, bhog was offered in the Ashram. In the evening Sree Sree Maa gave a short and profound discourse on Kriya Yoga. Like every year, a spiritual question-answer session was conducted by our guru-brother Dr. Barun Dutta. . The Hindi book 'Sree Sree Maa' (Hindi translation of Sree Sree Maa's biography) was released.

16th June – On the auspicious day of Sri Sri Jagannathdev's snan yatra, anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa was celebrated. In the afternoon, devotees received prasad. Bhajans were presented by our Guru-brothers and sisters in the evening. The beautiful collection of old Bengali songs was presented by Smt. Laboni Lahiri. At the end, Sree Sree Maa gave important advice to the devotees on, 'leading life – the spiritual way'.

30th June - On this day, the 31st session of

the 'Adhyatmik Sabha' was organized at the Ashram premises. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued his discourse on the Kathopanishad.

Forthcoming Events

Spiritual Discourse by Sree Sree Maa: 18th August, Sunday, at 11 am in the morning.

Janmastami: 24th August, Saturday, 7 p.m

Spiritual Congregation: 22nd September, Sunday at 7 p.m

Mahalaya: 28th September, Saturday

Navaratri Durga Puja: 29th September to 8th October

3rd Oct. (Panchami): Evening Programme

5th Oct. (Saptami): Evening Programme

6th Oct. (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.

7th Oct. (Navami) : Mahaprasad of Sree Durga Devi to be distributed in the afternoon.

Kojagari Laxmi Puja: 13th October, Sunday

Publication List 1

Publication List 2

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....